২০০২

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ❑ ১৮তম সংখ্যা

৩১ মার্চ, ২০০২ ইসাব্দ

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।'

—ইলহাম, ইমাম মাহদী (আঃ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের
২১তম সালানা জলসা ২০০২

সুন্দরবন জামাতের বড়-ভেটখালী হালকা মসজিদ 'বায়তুস্ সোবহান'

সুন্দরবন জামাতের মিরগাং হালকা মসজিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশেষ স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ

বেনিন সরকার ডঃ আবদুস সালাম মরহুমের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তার ছবিসহ ডাক টিকেট প্রকাশ করেছে। ডাক টিকেটে লিখা আছে ঃ "আবদুস সালাম মানবতার সেবক ফিজিক্সে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত"

ঘড়িলাল জামাতের মসজিদের পার্শ্বে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, সুন্দরবন জামাতের আমীর এবং স্থানীয় জামাতের পেসিডেন্ট ও সদস্যবৃন্দ।

সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম শামসুর রহমান (টি.কে) সাহেবের পুত্র এস. এম. মতিয়ার রহমান সাহেবের সদ্য নির্মিত বাড়িটি এম.টি.এ. টিমকে জলসার সময় ব্যবহার করতে দেয়া হয়। বাড়িটির মালিক ও তার পরিবারের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- এম.টি.এ. ইনচার্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বানিয়াজানের সদ্য নির্মিত মসজিদ

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হোন

বেকার সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা। আমাদের জামাতও এথেকে মুক্ত নয়। কারও কারও এ ভুল ধারণা রয়েছে যে, আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হলে চাকরী-বাকরী পাওয়া যায় বা রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের জামাত কেবল একটি ধর্মীয় জামাত। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর (সঃ)-এক গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ জামাতের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব মানুষকে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্মুখী করা। এবং সত্যিকারের ইসলাম চর্চা শিখানো। এভাবে আপামর মানব গোষ্ঠীর বিশেষ করে এর সদস্যগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুষ্ঠু বিকাশ থেকে শুরু করে তাদের আল্লাহ্ওয়াআলা মানুষ করে গড়ে তোলা। এজন্যে এ জামাতের প্রধান অর্থাৎ খলীফা দিন-রাত দোয়ার সাথে সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ যদি স্ব স্ব স্থানে নিষ্ঠাবান, নৈতিক ও আল্লাহ্ওয়ালা মানুষে পরিণত হয় তাহলে তদ্বারা গঠিত পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব আদর্শভাবে গড়ে ওঠবে এবং বিশ্ব সুশীল সমাজ গঠনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ জামাত কাজ করে যাচ্ছে। আর এ কাজে রসদ যোগানোর জন্যে এর সদস্যরা নিজ নিজ আয় অনুপাতে অর্থ এবং প্রয়োজনে সময়, মেধা-শক্তি কুরবানী করে যাচ্ছে। তাই বিগত শত বছরেরও কিছু বেশি সময়ের মধ্যে এ জামাত বিশ্বের ১৭৬টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্বল্প পরিসরে হলেও নিজেদের পরিমন্ডলে একটি সুস্থ পরিবেশ ও সুশীল সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

সুশীল সমাজের এটাও চাহিদা যে, এর সদস্যরা সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে। কোন জাতি বা ব্যক্তি পরগাছা বা পরনির্ভরশীল হয়ে বেশি দিন টিকতে পারে না। তাই আমাদের লোকদের এটা ভালভাবে বুঝা উচিত যে, প্রত্যেককে নিজস্ব শক্তি ও মেধা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। বেকার না থেকে অতি তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কাজ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহরীকে জাদীদের একটি মোতালেবাতেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ প্রসঙ্গে যুবকদের বেকার না থেকে যে কোন কাজ করার নসীহত করেছেন। কাজে নিন্দা নেই নিন্দা হলো হাত পাতাতে। নবী (সঃ)-এর এক হাদীসের আলোকে কবি লিখেছেন ঃ

নবীর শিক্ষা কোর না ভিক্ষা মেহনত করো সবে।

তাই আমি আমার ভাইদের বিশেষ করে যুবক ভাইদের বলবো, বেকার থাকা মহা অভিশাপ। বিরাট বিরাট কাজ কবে করবেন সেদিনের আশায় কেউ যেন চেয়ে না থেকে এখন এ মুহূর্তে যে কাজটি পাওয়া যায় তা করতে থাকেন। আর আমাদের ইলাহী জামাত। যা আয় করেন তাথেকে এতে রীতিমত চাঁদা দেন ও দোয়া করেন দেখবেন একদিন আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরো হবেই। এ ব্যাপারে আপনারা যুগ-খলীফার দোয়া ও পরামর্শও নিতে পারেন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ১৮তম সংখ্যা

১৭ চৈত্র ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ১৬ মুহাররম ১৪২৩ হিঃ কাঃ
৩১ আমান ১৩৮১ হিঃ শাঃ ৩১ মার্চ ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি হয় মাটিতেই চিরনিদ্রা যায়

বিশ্বে কোন সত্যকেই কখনও মানুষ প্রথমে 'আহলান সাহলান মারহাবা' বলে গ্রহণ করে নি; সেটা ধর্মীয় হোক, বিজ্ঞান বিষয়ক হোক বা অন্য কিছু। গ্যালিলিউ যখন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে-একথা প্রথম ঘোষণা করেন তখন তাঁকে কতই না নির্যাতন সইতে হয়েছিলো! যদিও পরবর্তীকালে তা গৃহীত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যু নিয়েও কম যায় নি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের দিকে যখন যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবহিত হয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর খবর দেন বিশ্ববাসীকে এবং শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর দেখিয়ে দেন তখনও বিশ্ব তাঁর কথাকে মেনে নেয় নি। বরং বিরোধিতা করেছে। তদানীন্তন ভারতের প্রায় ২০০ মুসলিম আলেম তাঁর বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া দিয়েছেন। বিগত শতাধিক বছর ধরে এ নিয়ে যেমন বিরোধিতা চলছে তেমনই অনেকে সত্য বলে মেনেও নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে আল্ আযহারের রেক্টর শ্রেণীর লোক এবং বহু গবেষকও রয়েছেন। এ নিয়ে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। তবে এতটুকু অবশ্যই বলা যায়, সত্য চিরদিনই সত্য তা গুটিকয়েক লোক গ্রহণ করলেও আর মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা তা বহু লোকে বল্লেও।

বিগত ১২ই মার্চ ২০০২ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় মাযারের ছবিসহ 'কাশ্মীরের শ্রীনগরেই চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন যীশুখৃষ্ট'? শীর্ষক একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে শ্রীনগর থেকে এ এফ পি। এতে বলা হয়েছে ঃ

" ... সুজন মারি ওলসন নামে নিউইয়র্কের ঐ গবেষক বর্তমানে শ্রীনগরে অবস্থান করে রোজাবাল নামে মাযারটি পরীক্ষা করছেন। স্থানীয় মুসলমানদের ধারণা, মাজারটি ইউজা আসফ নামের এক মুসলমান পীরের। তবে বেশ কয়েকজন গবেষক মনে করেন স্বয়ং যীশু খৃষ্ট বা ঈসা নবীর দেহই সমাধিস্থ হয়েছে এখানে। গবেষক ওলসন বলেছেন, কবরটি খুঁড়ে দেহাবশেষের ডি এন এ টেষ্ট ও কার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে তিনি এ নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে চান ...।

তবে রোজাবলি মাজারের ব্যবস্থাপকরা সেখানকার সমাধি খুঁড়তে দিতে রাজী নন। তারা বলছেন, এর ফলে মাজারের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে। তাই গবেষক ওলসন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ্‌র কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছেন। ওলসন বলছেন, একান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই তার গবেষণার উদ্দেশ্য এবং তিনি একজন সত্য সন্ধানী মাত্র ...। শেষ পর্যন্ত কট্টর ইহুদী ও খৃষ্টান চক্রের অপকৌশলে গবেষক ওলসনের ইচ্ছা পূরণ হবে বলে মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদের ইংল্যান্ড আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত 'হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয় মৃত্যু হ'তে নিষ্কৃতি লাভ' শীর্ষক ২-৪ জুন ১৯৭৮ তারিখে লন্ডনে কমনওয়েলথ ইন্সটিটিউট অডিটরিয়মে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এতে মরিশাস, গেম্বিয়া, লাইবেরিয়া, ঘানা ও সিয়েরালিওনের মহামান্য হাই কমিশনারগণ ও লন্ডনের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ইসরাঈলী বার গোত্রের ১২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। পশ্চিমা বার্তা পরিমন্ডল সহ গবেষক সমাজে এ নিয়ে বেশ আলোড়নের সৃষ্টিও হয়েছিলো।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ) এতে বৃটিশ কাউন্সিল অব চার্চকে ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে বিশ্বের যেকোন স্থানে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচনার আহবান জানিয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাতে সায় দেন নি। কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে যোগদানকারী ৬০০ প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ করেন এবং কবরটির সম্মানজনক অনুসন্ধান কাজ চালাবার জন্যে ভারত সরকারের নিকট অনুমতি লাভের আবেদন জানান। সাহায্য ও সহায়তার জন্যে ইউনেস্কোকে উপরোক্ত প্রস্তাবের কপি পাঠানো হয়। কিন্তু কোন্- কাল হাতের সুকৌশল ইঙ্গিতে এসব প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি তা আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন। উল্লেখ্য, আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঐশী নির্দেশে সর্ব প্রথম এ কবরটিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর বলে সনাক্ত করেন।

তাছাড়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে যে মহান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা ইতোমধ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতেও হ'তে থাকবে ঃ

"স্মরণ রাখবে কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী যারা বর্তমানে জীবিত রয়েছে তারা সকলে মারা যাবে কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানরাও মারা যাবে কিন্তু তাদের মধ্য হতেও কেউই মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানদের সন্তানরাও মারা যাবে কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হতে নাযেল হতে দেখবে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে (তাজকেরাতুশ শাহাদাতায়ন)।

আসল কথা আকাশে কেউ যায়নি আর আকাশ থেকে কেউ আসবেও না। মানুষ মাটি থেকে জন্ম নেয়, মাটিতেই চির নিদ্রা যায়। সুতরাং ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হবে না। পরিশেষে বলাই বাহুল্য, দুনিয়া এ সত্যকে একদিন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ ইরফানে হাদীস ঃ ভয়ের অবস্থা ও আশার ব্যাপকতা মুল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- নির্বাহী সম্পাদক	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ কুরআন সর্বকালের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'রায্যাক ও রাযিক' সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯-১২
❑ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ-আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৩-১৪
❑ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৫
❑ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৬-১৭
❑ রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
❑ নতুনদের পাতা		
● মাতা-পিতার সেবাতে জান্নাত	ঃ জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম	২০-২২
● হযরত মূসা (আঃ)	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন	২৩-২৪
● কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তাকওয়ার মধ্যে সকল ইবাদতের পূর্ণতা	ঃ মৌঃ মোজাফ্ফর আহমদ রাজু	২৪-২৬
● হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ২১তম বছর ১৯০২ সনের প্রধান প্রধান ঘটনা এবং আল্লাহ্র সাহায্য	ঃ অনুবাদ - জনাব কওসার আলী মোল্লা	২৭-২৯
● প্রথম বয়াত	ঃ জনাব আহমদ মইনুল কাদের হিমু	২৯-৩০
● স্মৃতির জাল বোনা	ঃ জনাব মোঃ এহসানুল হাবীব (জয়)	৩১
❑ আহমদীয়তের ধর্ম বিশ্বাস	ঃ	৩২
❑ সংবাদ	ঃ	৩৩-৩৫
❑ কবিতা ঃ প্রার্থনা	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩৫

প্রচ্ছদ ঃ উপরে ঃ সুন্দরবন জামাতের ২১তম সালানা জলসার দৃশ্য। নীচে ঃ সুন্দরবন জামাতের বড় ভেটখালী হালকার পাকা মসজিদ 'বায়তুস সুবহান' এবং মিরগাং হালকা মসজিদ।

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সালানা জলসা-২০০২ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৩৬তম সালানা জলসা আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ জুলাই ২০০২, টিলফোর্ড, ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বাংলাদেশ থেকে যারা উক্ত জলসায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আগামী ১০-৫-২০০২ তারিখের মধ্যে মোহ্তরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে। দরখাস্তের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র গ্রথিত থাকতে হবে ঃ

১। স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় কায়েদ / যয়ীম-এর সুপারিশ পত্র।

২। জামাতী চাঁদা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-সংগঠনের চাঁদা পরিশোধ আছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

৩। পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি (সাদা-কালো বা রঙ্গিন) ছবি।

৪। পাসপোর্টের ১টি ফটো কপি।

৫। বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত। দরখাস্তকারী জন্মগতভাবে আহমদী না হলে বয়াতের তারিখ দরখাস্তে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

দরখাস্তকারীকে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত কমিটির সামনে সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার জন্য পরবর্তীতে পাক্ষিক আহমদীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।

কমিটি

১। জনাব মীর মোবাশ্বের আলী	চেয়ারম্যান
২। জনাব এ কে রেজাউল করীম	সদস্য-সচিব
৩। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	সদস্য
৪। জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	সদস্য
৬। জনাব মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্	সদস্য

এ কে রেজাউল করীম
সদস্য-সচিব

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯। আর এ সকল শহরের[১০১৬] অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়েছে যে, তাদের ওপর আমাদের শাস্তি দুপুর বেলায় তাদের খেলা-ধূলায় মত্ত অবস্থায় আসতে পারে?

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০। অতএব তারা কি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? তবে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে কেউ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾

১০১। যারা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরে এর উত্তরাধিকারী হয় তাদেরকে কি ইহা পথ প্রদর্শন করতে পারে নি যে, আমরা চাইলে তাদের পাপের জন্য তাদেরকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয়ের ওপর মোহরও মেরে দিতে পারি, ফলে তারা আর (হেদায়াতের কথা) শুনতে ও বুঝতে পারবে না।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২। এগুলি হলো ঐ সকল শহর, যাদের বৃত্তান্তের কিছু আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করছি[১০১৭] এবং অবশ্যই তাদের নিকট তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার মত লোক ছিল না, কেননা তারা ইতঃপূর্বে (নিদর্শনসমূহকে) মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ্ এভাবেই কাফিরদের হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দেন।[১০১৮]

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। আমরা তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে শ্রদ্ধাশীল পাই নি, বরং তাদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ পেয়েছি।

১০১৬। "এ সকল শহর" শব্দ দ্বারা মক্কানগরী এবং হেযাজের পার্শ্ববর্তী শহরগুলিকে বুঝাচ্ছে। এর তাৎপর্য হলো, মক্কা প্রভৃতি শহরের লোকেরা কি আদ্ সামূদ, লূত-এর জাতি এবং শোআয়বের জাতির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না?"

১০৭। কুরআন করীম অতীত জাতিগুলির শুধু সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণ ছাড়া সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করে নি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিহাসের কোন পুস্তক 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি সম্বন্ধে কুরআন অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে না। ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করেছে যে, প্রাচীন জাতিগুলি সম্পর্কে কুরআন শরীফ যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছে তা একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ এবং যেসব প্রাচীন জাতি সম্পর্কে নানা কেচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেগুলি সমস্তই পৌরাণিক উপকথা।

১০১৮। যখন অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্-প্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করে, তখন তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়।

হাদীস শরীফ

ইরফানে হাদীস - ১০৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

ভয়ের অবস্থা ও আশার ব্যাপকতা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"যদি মু'মিন জেনে নেয় যে, খোদাতাআলার নিকট কী কী শাস্তি রয়েছে তাহলে কখনও বেহেশ্‌তের আশা করবে না আর যদি কাফির জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌তাআলার নিকট কী কী করুণা রয়েছে তাহলে সে কখনও তাঁর বেহেশ্‌ত থেকে নিরাশ হতো না" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্তাওবা, বাবু সা'তি রহমাতিল্লাহ্, হাদীস নং ঃ ৪৯৪৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

মুসলিম কিতাবুত্তাওবা থেকে এ বর্ণনা এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মু'মিন আল্লাহ্‌তাআলার শাস্তি ও পাকড়াওয়ের অনুমান করে যে, যখন তিনি শাস্তি দিতে আসেন ও পাকড়াওয়ের সিদ্ধান্ত নেন তখন বড়ই কঠোর ও কঠিন হবে ঐ পাকড়াও। যদি মু'মিন জানতে পারে যে, খোদা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে অনেক বড় পাকড়াও হয়ে থাকে তখন সে বেহেশ্‌তের আশাই রাখে না। কেন বেহেশ্‌তের আশা রাখে না? এজন্যে যে, মু'মিনের এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, কার্যতঃ সে এতই পাপী, সে বিনা আশায়ও পাপী আর ত্রুটি-বিচ্যুতি তো তার সাথেই লেগে রয়েছে। আর আল্লাহ্ যদি তার প্রত্যেকটি দুর্বলতাকে ধরেন তাহলে শাস্তি অবশ্য-প্রাপ্য হয়ে যাবে। আর যদি শাস্তি অবশ্য-প্রাপ্য হয়ে যায় আর সে যদি জানে যে, খোদার পাকড়াও বড়ই কঠোর তখন সে বেহেশ্‌তের আশাই পরিত্যাগ করে বসবে। তার প্রাণে গেঁথে যাবে যে, আমার কখনও বেহেশ্‌তের সৌভাগ্য লাভ হ'তেই পারে না।

আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের ভান্ডারের আন্দাজ যদি কাফিরের করা হয়ে যায় তাহলে সে তাঁর বেহেশ্‌ত থেকে নিরাশ হবে না আর দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, এত বড় রহমত থেকে কোন্ হতভাগাই বঞ্চিত থাকতে পারে? বাহ্যদৃষ্টিতে এ দু'টি অসঙ্গত কথা। এদিকে খুবই ছোট একটি ভুলের ওপরে এ ভীতি যে, খোদা খুবই কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন, অন্যদিকে সারা জীবনের পাপ সত্ত্বেও যা পাহাড় তুল্যই হোক এ আশা যে, আল্লাহ্ এ সব পাপকে ক্ষমা করতে পারেন। এ দু'টি কথা বাহ্যিকভাবে অসঙ্গত ও বিপরীতার্থক। কিন্তু আসলে বিপরীতার্থক নয়। আসল ঘটনা এই যে, এটাই তো পুলসিরাত, যাকে ভয় করার জন্যে আমাদেরকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সাবধানতার সাথে এ পথকে অতিক্রম করা যে, খোদার ক্রোধের দিকে যেন পড়ে না যাই আর এ আশায় এ পথ অতিক্রম করা যে, যখনই পা উঠে যেন খোদার রহমতের দিকেই পড়ে। এটা সেই রাস্তা যার দিকে এ হাদীস আহ্বান জানাচ্ছে (দৈনিক আল্ ফযল, ৫-১১-১৯৯৮)।

অনুবাদ- নির্বাহী সম্পাদক

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কুরআন সর্বকালের জন্য

কিন্তু সম্মানিত কুরআনের প্রয়োজন ছিল সকল যুগের সংশোধন। কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল অসভ্য অবস্থা থেকে মানুষকে রূপান্তরিত করা। মানবিক শিষ্টাচার থেকে সুসভ্য মানবে উন্নীত করা এবং এর ফলশ্রুতিতে আইনের সীমা ও আদেশের অনুবর্তিতায় পথ পরিক্রমণের পর খোদাযুক্ত মানুষে পরিণত হওয়া। কথাগুলো সংক্ষেপে হলেও এর সহস্রাধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেহেতু ইহুদী, প্রকৃতিবিদ, অগ্নিউপাসক এবং বিভিন্ন জাতিতে কুপ্রথা প্রচলিত ছিল এ জন্য আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌তাআলার আদেশে সকলকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল।" এ সমস্ত শিক্ষা এ কারণেই কুরআন শরীফের অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রয়োজন ছিল যা সময়ে সময়ে প্রচলিত ছিল। এবং ঐ সমস্ত সত্যতার অধিকারী ছিল যা আকাশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীগণের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে পৌছে দেয়া হতো। সমস্ত মানবজাতি পবিত্র কুরআনের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন বিশেষ জাতি, দেশ বা যুগ নয়। এবং ইঞ্জিলের দৃষ্টিতে (শুধু) এক বিশেষ জাতি ছিল। এ কারণে মসীহ্ (আঃ) বার বার বলেছেন ঃ "আমি ইস্রায়ীলের হারানো মেষগুলোর সন্ধানে এসেছি।"

তওরাতের পরে কুরআন শরীফের প্রয়োজন

অনেকে বলে থাকেন- কুরআন কী নিয়ে এসেছে? এতে তো ওগুলোই রয়েছে যা তওরাতে লিপিবদ্ধ আছে! এ হীন দৃষ্টিভঙ্গীই কতক খৃষ্টানকে "কুরআন নিষ্প্রয়োজন" এরূপ সাময়িকী (পত্রিকা) প্রকাশে সাহসী করে তুলেছে। হায়! তাদের মধ্যে যদি সত্যিকার জ্ঞান ও দিব্য-দৃষ্টির অংশ থাকতো তাহলে তারা পথভ্রষ্ট হতো না। এরূপ লোকেরা বলে থাকে ঃ তওরাতে লিখিত আছে - তোমরা ব্যভিচার করবে না; অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে লেখা হয়েছে- "ব্যভিচার করবে না'। কুরআন একেশ্বরবাদিতা শিক্ষা দেয় এবং তওরাতও এক খোদার উপাসনা শিক্ষা দান করে। তাহলে তফাত কী? বাহ্যতঃ প্রশ্নটি জটিল। অনভিজ্ঞ লোকের সামনে উপস্থাপন করলে সে ঘাবড়িয়ে যাবে। আসল কথা হলো, এ ধরনের সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের সমাধানও আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে অসম্ভব নয় যা সময়ের প্রয়োজনে প্রকাশ পেতে থাকে। এটাইতো হলো কুরআনী তত্ত্ব-জ্ঞান যা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফ ও তওরাতের মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যই রয়েছে। এটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তওরাতে শুধু মূল পাঠ রয়েছে, এতে কোন দলীল-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু মহান কুরআন সঠিক ও উপযুক্ত গুণাবলীর অধিকারী। এর কারণ হলো- তওরাতের (অবতরণের) যুগে মানুষের স্বভাব বন্যদের ন্যায় ছিল, কিন্তু কুরআনের অবতরণের যুগে সভ্যতার উপযোগী গুণাবলীর বিনাশ ঘটেছিল। এ কারণেই কুরআন শরীফ ঐ পন্থা অবলম্বন করেছে, যা নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে থাকে এবং বলে দেয় যে, 'এটাই হলো নৈতিকতার অর্জন'। শুধু উপকারিতা ও অর্জনের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না বরং সঠিকভাবে দলীল-প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপন করে যাতে করে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ না থাকে। যেরূপভাবে আমি বলে এসেছি যে, কুরআন শরীফের অবতরণের যুগে মানুষ সঠিক গুণাবলী অর্জনে সমর্থ হয়েছিল এবং তওরাতের যুগে তাদের বর্বরের ন্যায় অবস্থা ছিল। হযরত আদম (আঃ) থেকে যুগ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরিশেষে কুরআন শরীফের (অবতরণের) যুগে তা বৃত্তের আকারে পূর্ণতা লাভ করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, "যামানা গোলাকার হয়ে গেছে।" আল্লাহ্‌আআলা বলেছেন- "মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদীম্ মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীয়্যীন" অর্থাৎ মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর (৩৩ঃ৪১)।

যুগের চাহিদা হলো নুবওয়তের উৎস-মূল

যুগের চাহিদা হলো নবুওয়তের উৎস-মূল। অন্ধকার রাত্র ঐ আলোকে আকর্ষণ করে, যা পৃথিবীকে অন্ধকার মুক্ত করে। সেই প্রয়োজনের অনুপাতে নুবওয়তের ধারা শুরু হয়েছে। এবং কুরআন শরীফের যুগে পৌছানোর পর পূর্ণতা লাভ করেছে। এতে (যেন) সকল প্রয়োজন মিটে গেছে এ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, তিনি অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ) খাতামান্নাবীয়্যীন। এখন (তওরাত ও কুরআনের শিক্ষায়) প্রধান ও স্পষ্ট পার্থক্যের মধ্যে একটি হলো যে, কুরআন শরীফ এমন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে তওরাত যাকে স্পর্শও পর্যন্ত করে নি।

কুরআন ও তওরাতে দ্বিতীয় পার্থক্য

এবং দ্বিতীয় পার্থক্য হলো- তওরাত শুধু বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করেছে, অন্য গোত্রের সাথে কোন সম্পর্ক বা সংযোগই রাখে নি, এবং এ কারণেই সে দলীল-প্রমাণের প্রতি গুরুত্ব দেয় নি, কেননা তওরাতের দৃষ্টিতে অন্য কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম যেমন ঃ নাস্তিক, দার্শনিক এবং ব্রাহ্মসমাজি ইত্যাদি কেউ ছিল না। অপরদিকে কুরআন শরীফ যেহেতু সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছে এবং এ পর্যন্ত এসে সকল প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি ঘটেছে। এ কারণেই সম্মানিত কুরআন ধর্ম-বিশ্বাস এবং পালনীয় আদেশাবলীও যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণনা করেছে। (চলবে)

(মলফূযাত প্রথম খন্ড)

অনুবাদ - **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌র 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১লা মার্চ, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর এরশাদ করেন।

আল্লাহ্‌তাআলার **সিফ্‌ত** বা গুণবাচক নাম সম্পর্কে আলোচনা করছি। আল্লাহ্‌র **'আযীয'** সিফতের উপর আলোচনা অব্যাহত আছে। কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র আযীয নাম যেভাবে উল্লেখ হয়েছে তার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করছি।

'আযীয' মূলতঃ বড় সম্মানিত ও মর্যাদাবান অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এমন মর্যাদাবান যেখানে কোন জোর-জুলুম নেই। আযীয বাদশাহ্‌কেও বলা হয়। কিন্তু বাদশাহ্ আযীয এর মধ্যে জোর-জুলুম শামীল হয়ে থাকে। যদি বাদশাহ্‌র মধ্যে জোর-জুলুম না থাকে তবে সম্মানও বাকী থাকে না। আযীয বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি সম্মানিত ও শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, বিজয়ী। তাঁর মধ্যে পরাক্রমশালী ও সম্মানিত হওয়ার উভয় গুণ এক সাথে থাকে। আজকের প্রথম আয়াতঃ

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে চান তোমাদের আকৃতি প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ৭)

তারপরের আয়াত সূরাতু আলে ইমরান ১৯ নং আয়াত ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই; এবং ফিরিশ্‌তাগণও এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম হয়ে (সাক্ষ্য দিচ্ছেন) তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে আকরম (সঃ)-কে আরাফাতের মাঠে এ আয়াত পড়তে শুনেছি। (উপরে বর্ণিত আয়াত) তারপর হুযূর (সঃ) বলেছেন, "আমিও এই সাক্ষ্যদানকারীদের একজন।"

আর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বলেছেন, 'আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি এমন একটি বাক্য বলতে পারি, যদি কেউ পবিত্র অন্তঃকরণে উক্ত বাক্যটি পাঠ করে তবে তার জন্য আগুন হারাম করে দেয়া হয়। এ কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত বর্ণনাকারীকে বলেছেন, আমি

তোমাকে ঐ বাক্যটি কী বলতে পারি? ঐ বাক্যটি 'কলেমা ইখলাস' যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামকে ইয্‌যত দান করেছেন; এবং ঐ কলেমা কলেমায়ে তাকওয়াহ্ যা পড়ার জন্য আঁ হযরত (সঃ) আজীবন তাকিদ করেছেন, ঐ কালেমা হচ্ছে কলেমা শাহাদত।"

কলেমা শাহাদত-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল প্রকার মাবূদের অস্বীকার ও একমাত্র এক আল্লাহ্‌র প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। প্রতিটি কথা একমাত্র তাঁর দিকে ধাবমান হতে হবে। এটি আসলে ইসলামের সারাংশ। আবূ লায়লা বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর মজলিসে বসেছিলাম। এক বেদুঈন এসে বলল, আমার ভাই অসুস্থ। আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে? বেদুঈন বলল, 'সে পাগল হয়ে গেছে।' হুযূর (সঃ) বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসল। আঁ হযরত (সঃ) নিজের সামনে ঐ অসুস্থ ব্যক্তিকে বসালেন এবং রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী বলছেন, হুযূর (সঃ) তার প্রতি সূরাতুল ফাতিহা পড়ে দম করলেন। তারপর সূরাতুল বাকারার কয়েকটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের তিন আয়াত পড়ে দম করলেন। তারপর সূরাতু আলে ইমরানের ১৯নং আয়াতও পড়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। তারপর সূরাতুল আরাফের, "ইন্না রব্বাকুমুল্লাযী খালাক্ব" সূরাতুল মু'মিনীনের ১১৮নং আয়াত, শেষের তিন সূরা পড়ে দম করলেন। তারপর ঐ ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তার কোন রোগ ছিল না।

দম অর্থ দোয়া। যখন কোন ঔষধ বা ডাক্তার পাওয়া না যায়; অন্য কোন উপায় থাকে না তখন দোয়া করে দম করা যায়। সূরাতুল ফাতিহা অন্যতম একটি দোয়া।

সূরাতু আলে ইমরানের ২৭নং আয়াত।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থ ঃ তুমি বল, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান কর; যার নিকট হতে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও ...

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক বর্ণনায় বলেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) একবার দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি আবূ জাহল ইবনে হিশাম অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, দু'জনের একজনকে দিয়ে ইসলামের সাহায্য কর।'পরের দিন সকালে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ইসলাম কবুল করেছিলেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) একবার দোয়া করেছিলেন, "হে

আল্লাহ্! তুমি উমর ইবনে খাত্তাবকে দিয়ে ইসলামকে বিজয় দান করা।" হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত খুবই গুরুত্ব বহন করে এবং রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করে। কারণ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নামও যদি হোত তবু কোন আশ্চর্য হবার কারণ ছিল না।

আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে একজন মহিলা উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এক যুগ ছিল যখন সবচেয়ে বেশি আপনার ঘর-বাড়ী সম্পর্কে আমরা চাইতাম যে, এরা পৃথিবীতে বেইয্যত হোক। আজ আমরা সবচেয়ে বেশি চাই যে, আপনার ও আপনার গৃহবাসীদের সবচেয়ে বেশি ইযয্ত হোক। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের ঘর-বাড়ী সম্পর্কেও আমার এমনই প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা আছে।"

হযরত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান ও হুসায়েন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে বিতর নামায পড়ার জন্য কিছু দোয়া শিখিয়েছিলেন। **আল্লাহুম্মা আহ্দিনি ফিমা হাদায়তা ওয়া আফিনী ফিমা আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফিমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বারিকলি ফিমা আতায়তা, ওয়াকিনি শাররা মা কযায়তা। ইন্নাকা তাকযি, ওয়ালা ইউকযা আলায়ইকা ইন্নাহু লা ইয়াযিলু মান ওয়াল্লায়তা ওয়ালা ইয়াইয্যু মান আদায়তা তাবারক্তা রব্বানা ওয়া তা'আয়লায়তা।"**

অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ্! আমাকেও ঐ সমস্ত মানুষের সাথে হেদায়াত দাও যাদের তুমি হেদায়াত দিয়েছ, তুমি আমাকেও সুস্বাস্থ্য দান কর তাদের সাথে যাদেরকে তুমি সুস্বাস্থ্য দিয়েছ। তুমি আমারও বন্ধু হয়ে যাও তাদের সাথে যাদের তুমি বন্ধু হয়েছ। তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তাতে বরকত (কল্যাণ) প্রদান কর। তুমি যা তকদীরে লিখে দিয়েছ তার মধ্যকার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। তুমি যা খুশী সিদ্ধান্ত নিতে পার, তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার বন্ধু হয়েছ তাকে কেউ বেইয্যত করতে পারে না। তুমি যার শত্রু হয়েছ সে কখনও সাহায্য পায় না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি বড়ই কল্যাণময় বরকত ওয়ালা।" এখানে হুযূর (সঃ) বড় বিনয় অবলম্বন করে বলেছেন, 'ঐ সব মানুষের সাথে আমাকে হেদায়াত দাও ...।" নতুবা প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত অন্যরা তাঁর (সঃ) থেকে পেয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, মানুষ চায় যে, পৃথিবীতে সে যেন সম্মানিত হয়ে থাকে। কিন্তু আসল সম্মান কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। **"তুইয্যো মানতাশাও ওয়া তুযিল্লো মান তাশাও"** (৩ঃ২৭)। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ যদি চান তবে যাদের ঘর দুঃখ-দুর্দশায় ভরা তাদের ঘরে শান্তি ও আরামের দিনের উদয় করতে পারেন। আর যদি তিনি চান যাদের ঘরে আরাম-আয়েশ আছে তাদের ঘর অশান্তিতে ভরে যাবে। থাকে তিনি চান ইয্যত দেন, তিনি যাকে চান বেইয্যত করে দেন। আঁ হযরত (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ দোয়া চেয়েছিলেন আল্লাহ্ তাঁদের ইয্যত দিয়েছেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন.

"হে আল্লাহ্! হে সকল রাজত্বে অধিকারী। তুমি যাকে চাও রাজত্ব প্রদান কর। আর যার কাছ থেকে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে চাও ইয্যত দান কর। যাকে চাও রিয্ক দান কর। প্রত্যেক প্রকার মঙ্গল যা মানুষ চায় তা সব কেবল তোমারই হাতে। তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

সূরাতু আলে ইমরানের আয়াত ঃ ৬২-৬৩ পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত তামীম আদ্দারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি; হুযূর (সঃ) বলেছেন, ইসলামের বাণী ঐ সমস্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌছবে যেখান পর্যন্ত রাত ও দিনের প্রভাব পড়ে। আল্লাহ্ কোন শহর গ্রাম এমন রাখবেন না যেখানে কোন গৃহে ইসলাম প্রবেশ করবে না। প্রত্যেক উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিকে ইয্যত দিবেন যার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে। এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বেইয্যত করবেন যাতে কুফরী (ধর্মহীনতা) অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।" রাবী বলেছেন, আমি নিজেও সাক্ষী যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারাই মঙ্গল ও ইয্যত লাভ করেছেন, আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি তারা বেইয্যত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের প্রত্যেক আহমদী সাক্ষী আছেন। আহমদীয়তের কল্যাণে আহমদীরা বড়ই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন আল্লাহ্র ফযলে। সাথের গয়ের আহমদীরা আহমদীদের তুলনায় সর্বত্রই বেইয্যত হয়েছে। নিজেদের অঞ্চলে ও তারা বেইয্যত হয়েছে। আর আহমদী যারা হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছেন। অনেক বড় বড় সম্মানের অধিকার হয়েছেন। তাছাড়া আর্থিক দিক থেকেও বড় উন্নতি করেছেন। এটাতো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূরাতু আলে ইমরান ১২৬, ১২৭নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলেন, হ্যাঁ, বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর এবং উত্তেজিত হয়ে তারা যদি তোমাদের উপর এ মুহূর্তেই চড়াও করে তাহলে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক পাঁচ হাজার দুর্ধর্ষ ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

স্মরণ রাখবেন, ফিরিশ্তা নাযেল হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এটি মু'মিনদের মনোবলকে বাড়াবার জন্য। ফিরিশ্তা নাযেল হোক বা না হোক আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ যখন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্তাআলা আবূ জাহলকে হত্যা করেছেন। হুযূর (সঃ) বললেন, **"আল্হামদুলিল্লাহিল্লাযী নামাসারা আবদাহু ওয়া আয্যা দীনাহু"** -সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজ ধর্মকে ইয্যত দিয়েছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) প্রায়শঃ পড়তেন, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, আআয্যা দীনাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজেমাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু ওয়া লা শায়য়া বা'দাহু!"** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একাই তাঁর লস্করকে ইয্যত দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দার সাহায্য করেছেন। তিনি একাই তাঁর সকল বিরোধীদের পরাজিত করেছেন। তারপর আর কী আছে?

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۭ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٧﴾

সূরা নিসার ঃ ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'জাহান্নামীদের শরীরের চামড়া যখন জ্বলে যাবে তখন আবার তাদের চামড়া পরানো হবে যেন আরো আযাব দেখা যায়।'

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র থেকে জেনে খবর পেয়ে বলেছেন, এ সমগ্র বিশ্বব্যাপী জান্নাতের বিস্তৃতি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছেন, "তাহলে জাহান্নাম কোথায়?"

মানুষ ভেবেছে যে, কোথাও বিরাট এলাকা জুড়ে জান্নাত আর অন্য কোথাও বিরাট এলাকা জুড়ে জাহান্নাম। অথচ এ সমগ্র বিশ্বব্যাপী যেখানে জান্নাতের বিস্তৃতি সেখানেই জাহান্নামেরও অবস্থান।

আঁ হযরত (সঃ) উত্তরে বলেছেন, "এখানেই জাহান্নামও আছে। তোমরা বুঝ না।" এখানেই জান্নাত এখানেই জাহান্নাম। মৃত্যুর পরে বা রোজ হাশরের বিচার দিনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"বেহেশতেও প্রতিদিন কিছু নতুনত্ব সৃষ্টি হতে থাকবে।" বেহেশ্‌তের ব্যাপারে এটি আমাদের ভুল ধারণা যে, স্থির ও অবিচল, স্থবির অবস্থানের নাম জান্নাত। জান্নাত স্থবিরতার নাম হ'তে পারে না। কারণ যদি সর্বক্ষণ একই স্থানে অচল-অটল অবস্থান হয় তবে তো বিরক্তি কর হবে। সুতরাং এটি সত্য কথা যে, সেখানেও পরিবর্তন হতে থাকবে অবস্থা ও অবস্থান। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "বেহেশ্‌তে প্রতিদিন কিছু নতুনত্ব সৃষ্টি হ'তে থাকবে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, "তাদের শরীরের চামড়া বদলে দেয়া হবে।" আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির কুলকিনারা নেই। আল্লাহ্‌তাআলার কর্মকান্ডের কোন শেষ সীমানা নেই। ... অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হ'তে থাকবে।"

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

তারপরের আয়াত হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অর্থ ঃ এবং তাদের এ বক্তব্যের কারণে, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করেছে, অথচ না তারা তাকে হত্যা করেছিল এবং না তারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিহত করেছিল, বরং তাদের নিকটে তাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয় যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করে তারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাদের এ বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নেই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত এবং নিশ্চিতরূপে তারা তাকে হত্যা করে নি।বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ঃ ১৫৮, ১৫৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"তারা বলে যে, ঈসা নবী উল্লাহ্‌কে আমরা হত্যা করেছি। অথচ তারা না তো তাকে হত্যা করেছে, না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে, বরং বিষয়টি তাদের জন্য অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টানরা বলছে, ঈসাকে জীবিত আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে, ইহুদীরা বলছে, আমরা তাকে মেরে ফেলেছি। উভয় দলই সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তারা নিজেদের অনুমানের ও কল্পনার ভিত্তিতে এমন কথা বলছে। অর্থাৎ খৃষ্টানদের ধারণা মতে না ঈসা আকাশে গেছেন আর না ইহুদীদের কথা মত ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। বরং সঠিক ঘটনা এই যে, ঈসা তাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য এক দেশে চলে গেছেন। স্বয়ং ইহুদীরাও সুনিশ্চিত নয় যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে। আসলে আল্লাহ্ ঈসাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।"

হযরত ঈসা (আঃ) এখানে বলা হয়েছে- **ওয়ামা সালাবুহু** তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে নি **ওয়ামা কাতালুহু ইয়াকীনান** অর্থ তারা নিশ্চয় হত্যা করতে পারে নি।" তারা বাহ্যিকভাবে তো ক্রুশ বিদ্ধ করেছে অর্থাৎ ক্রুশে ঈসার বদলে অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্রুশ বিদ্ধ করে নি। কিন্তু ঈসা ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্ আযীয। তিনি তাকে ইয্যত বা সম্মান দেন যে তাঁরই জন্য হয়ে যায়। তিনি হাকীম ও অর্থাৎ তিনি তাদের কল্যাণ সাধন করেন যারা তাঁর প্রতি অবিচল অবস্থা ও ভরসা করে। আল্লাহ্ বলেছেন, আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে, আমাদের উপরোক্ত বর্ণনা যা আমরা আহলে কিতাবের ধারণা সম্পর্কে দিয়েছি তার উপর ঈমান রাখে না। আমরা উপরে যা বলেছি তাই সঠিক। তা এই যে, তারা কেউ আন্তরিক ও নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে না যে, মসীহ্ ক্রুশে মারা গেছেন। ইহুদী খৃষ্টান সবাই কেবল অনুমানের ভিত্তিতে বলে যে, মসীহ্ ক্রুশে মারা গেছেন। হ্যাঁ আসল কথা এই যে, মসীহ্ ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে তারা জানে না যে, তিনি কবে কোথায় মারা গেছেন। এর উত্তর আমরা দিচ্ছি যে তিনি মারা গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার রূহ আল্লাহ্‌র কাছে গেছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা এখানে বলেছেন, তিনি আযীয ও হাকীম অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এখানে 'আযীযান হাকীমা' এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহ্ যাকে চান ইয্যত দেন আর নিজ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে সকল প্রকার ফযল নাযেল করেন। কোন ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র কোন কামেল ওলীর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যেমন ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইয্যতের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি বরং আল্লাহ্ তার ইয্যতকে বৃদ্ধি করেছেন। উত্তম ফল দিয়েছেন। যারা ঈসাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল তাদেরকে তিনি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। অতএব আপনারা বুঝে নিন যে, 'বার্ রাফায়াহুল্লাহু ইলায়হে'-এর তফসীর এটাই। আমাদের লোকেরা আমাদের এই অর্থকে গ্রহণ করে না। তারা আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামের প্রতি বিদ্রূপ করে। তারা উপরন্তু আয়াতের শানে নযুলের প্রতি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করে না। তাদের যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ ও তার রসূল (সঃ) ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সাক্ষী দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং বড় বড় ইমামগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারপরও তারা বলে যে, আল্লাহ্‌তাআলা ঈসাকে মৃত্যুর পরও পুনরায় জীবন দান করতে পারেন। তারা একথা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্‌র কুদরতের সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই, যা তাঁর সত্য অঙ্গীকারের বিপরীত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সম্পর্কে আরো বলেছেন, "ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে "আল্লাহ্! আমি এমন যোগ্যতা রাখি না যে, ওসব কথাকে প্রতিহত করে তাদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করি যেসব কথাকে আমি মন্দ মনে করি। আর আমি ঐ সমস্ত পুণ্যকর্ম করতে পারি নি যা আমি করতে চেয়েছিলাম। অন্যরা তো নিজের প্রাপ্যকে নিজের হাতে রাখে। আমি তো তা করিনি। আমার গর্বতো আমার কাজের মধ্যে। আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আর কেউ নেই। হে আল্লাহ্ তুমি সর্বোচ্চ। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্ তুমি এমন হ'তে দিও না যে, আমার

শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করাতে পারে। আর এমনও ক'র না যে, আমার বন্ধুদের দৃষ্টিতে আমি অপমানিত হই। এমন যেন না যে, আমার তাকওয়াহ্ আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলে দেয়। এমনও করো না যে, ইহজগৎ আমার খুশীর জায়গা ও আসল উদ্দেশ্য হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিকে আমার উপর আধিপত্য প্রদান কর না যে আমার উপর দয়া করে না। হে আল্লাহ্! তুমি বড় করুণাময়। তুমি এমনই কর। তুমি তাদের উপর দয়াময় হও যারা তোমার কাছে দয়া ও করুণা ভিক্ষা করে।"

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٥﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٦﴾

(সূরাতুন্ নিসা ঃ ১৬৫-১৬৬)

উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আমরা কি এ কথা চিন্তা করতে পারি যে, পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র অশেষ রহমত ছিল, অতএব, তরবিয়তের সমর্থনের জন্য হাজার হাজার নবী-রসূল ও মুহাদ্দিসগণকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের এই উম্মতের উপর আল্লাহ্র গযবের সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কুরআন শরীফ নাযেল করে চিরদিনের জন্য আলেমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) কে বলেছিলেন; "ওয়া কালাল্লাহো মূসা তাকলিমা ... অর্থঃ তিনি মূসার সাথে অনেক কথা বলেছেন তার সমর্থনের জন্য অনেক অনেক রসূল প্রেরণ করেছেন যারা শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছিলেন। যেন রসূলগণের (আগমনের পরে) মানুষের কাছে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। অনেক রসূল দেখে যেন মানুষ তওরাতের প্রতি ঈমান আনে। আরো বলেছেন, 'আমরা অনেক রসূল প্রেরণ করেছি যাদের অনেকের বৃত্তান্ত ইতঃপূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেকের বৃত্তান্ত বলি নি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ ধরনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র যে রকম রহমত ছিল মুসলিম উম্মতের জন্য তেমন ছিল না। এসব কথা এমন যা কেবল কথার কথা যা তারা মুখে আনে, ঈমানের জন্য তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ মানুষ খুবই দুর্বল।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন,

"এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মের পূর্ণতার অর্থ এই নয় যে, এর হেফাযতের কোন প্রয়োজন নেই। উপমা এরকম যে, একটি অতি সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করা হয় যার দেয়াল, দরজা, জানালা সবই খুবই চমৎকার। কিন্তু নির্মাণের পর ফেলে রাখা হয়। দেখা-শোনা করা হয় না। কালক্রমে সব পুরাতন হয়ে ময়লা হয়ে নষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন কেউ যদি ঐ বাড়ীর সংস্কার করতে চায় তাকেও নিষেধ করে দেয়া হয়। এখানে খুব স্পষ্ট যে, এমন সংস্কারে বাঁধা দেয়া বড়ই বোকামী হবে। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কিছুরই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া ভিন্ন কথা আর তার সৌন্দর্য ও কার্যকারিতাকে কায়েম রাখার জন্য তার সংস্কার করতে থাকা ভিন্ন কথা। স্মরণ রাখা দরকার যে, বুদ্ধিমান মানুষ ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে না। হ্যাঁ, ধর্মের কথা ভুলতে গেলে তা পুনরায় মানুষের অন্তরে স্মরণ ও কায়েম করে দেয়।

এমন কথা বলে যে, মুজাদ্দিদীনের প্রতি বিশ্বাস আনা ফরয নয়- একথা আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত। কারণ তিনি বলেছেন, **ওয়া মান কাফারা বাদা যালিকা ফাউলায়িকা হুমুল কাসিকূন"** অর্থ ঃ খলীফা প্রেরণের পরে যারা তাঁকে অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিকারী হবে (সূরাতুন নূর ঃ ৫৬)।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٩﴾

অর্থ ঃ এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, এটি আল্লাহ্র তরফ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৩৯)

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে মক্কা বিজয়ের অভিযান চলাকালে একজন মহিলা চুরি করেছিল। ঐ মহিলার স্বামীও তার পরিবারের লোকেরা হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নিকট এসে ঐ মহিলার পক্ষে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে সুপারিশের জন্য বলেছিলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে ঐ মহিলার পক্ষে বললেন, হুযূর (সঃ)-এর পবিত্র মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি (সঃ) বললেন, 'তোমরা আমাকে আল্লাহ্র নির্ধারিত দন্ডের বিপক্ষে সুপারিশ করছ? উসামা তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সন্ধ্যা বেলা হুযূর (সঃ) বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। হুযূর (সঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপনের পরে বললেন, "তোমাদের পূর্বে অনেক মানুষকে আল্লাহ্তাআলা কেবল এ জন্য ধ্বংস করেছেন যে, তাদের মধ্যে যখন বড় উচ্চ বংশীয়দের মধ্যে কেউ চুরি করত তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ চুরি করত তখন তাকে শাস্তি দিত। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তবু আল্লাহ্র কসম আমি তার হাত কেটে দেব।" তারপর ঐ মহিলার হাত কাটার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং তদনুসারে তার হাত কাটা হয়েছিল। ঐ মহিলা খাঁটি অন্তঃকরণে তওবা করেছিল। তার বিয়েও হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছিলেন, ঐ মহিলা আমার কাছে অনেক সময় আসত। আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতাম। আমরা তার প্রতি বরাবর সদয় ছিলাম।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٨﴾

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٩﴾

(সূরাতুল মায়েদা ঃ ১১৮-১১৯)

উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করার পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন,

হযরত ইয়াসরা বিনতে হুওয়াদা বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আবূ যার কে বলতে শুনেছি, একদিন হুযূর (সঃ) একই আয়াত বারবার পড়ছিলেন। আয়াতটি ছিল ঃ "ইনতুয়াযযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুকা ওয়া ইন তাগফিরলাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম"।

"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তোমারই বান্দা আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরাতুল মায়েদা ঃ ১১৯)।

অনুবাদ- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রায্‌যাক ও রাযিক' সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৮ জানুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলার সিফ্‌ত (গুণবাচক নাম) রায্‌যাক ও রাযিক সম্পর্কে যে ধারাবাহিকভাবে খুতবা চলছে এ খুতবাটিও সে সম্পর্কেই হবে। আগামী খুতবাতেও তা গড়াতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথম সূরাতুল আ'রাফের ৩৩তম আয়াত আপনাদের সামনে পাঠ করছি ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "তুমি জিজ্ঞেস কর, 'আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) সৌন্দর্যকে কে হারাম করতে পারে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন এবং রিয্‌কের মধ্যে পবিত্র জিনিসগুলোকেও?' তুমি বলে দাও, 'তা ইহ জীবনেও তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে (এবং) কিয়ামত দিবসে তো একান্তভাবে (কেবল তাদেরই জন্য) হবে। এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী তাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে।"

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সুরাতুন নাহ্‌লের ৭৩তম আয়াত ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "আর আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন, আর তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসগুলো থেকে রিয্‌ক দিয়েছেন। তবু কি তারা মিথ্যাতেই ঈমান আনবে আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত (অনুগ্রহ)-কে অস্বীকার করবে?

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস যা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, পবিত্রকেই গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সে আদেশই দিয়েছেন যা তাঁর রসূলদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রসূলরা! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাও ও সৎকাজ কর; যা তোমরা কর তা নিশ্চয় আমি জানি।' তিনি আরও বলেন, 'যে রিয্‌ক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তোমরা কিছু পবিত্র জিনিস খাও।' তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে, যার চুল এলোমেলো ও ধুলোমাখা এবং তার পোষাক ইত্যাদি হারাম এমনকি খাদ্যও হারামই হয়ে থাকে। এরপর তার সম্পর্কে তিনি (সঃ) বলেন, 'তার দোয়া কী করে কবুল হতে পারে?'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'তোমাদের সবচেয়ে উত্তম খাবার হচ্ছে তা, যা তোমরা নিজেরা উপার্জন করে খাও এবং তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওউওয়াল (রাঃ) বলেন, 'হুরমত (নিষিদ্ধতা) চার প্রকারে ঃ এক, যা মানুষের প্রাণ নাশ করে তা হারাম, যেমন মৃত প্রাণী। দুই, যা কাম ও ক্রোধকে বাড়ায়, যেমন শূকর। তিন, যা স্বভাব বৃত্তি ও ক্ষমতাগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন রক্ত যাতে রয়েছে বিষক্রিয়া, এটা খিঁচুনী ও অসারতা সৃষ্টি করে। যেসব জাতি মৃতপ্রাণী, শূকর, রক্ত এবং গয়রুল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে থাকে তাদের মধ্যে 'ইলাহীয়াত' (ঐশীসূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী) বুঝার শক্তি লোপ পায়। চার, যা গয়রুল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয় এবং এটা শির্‌ক।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'পবিত্র জিনিস খাও ও পবিত্র আমল কর- এ আয়াতে (প্রথম) আদেশটি হচ্ছে দৈহিক সুস্থতা বিধানের জন্যে। সেজন্যে **'কুলূ মিনাত্ তাইয়্যবাত'**-এর নির্দেশ রয়েছে। আর দ্বিতীয় আদেশটি হচ্ছে রূহানী সুস্থতা বিধানের উদ্দেশ্যে , সেজন্যে ওয়া' **মালুস্ সালেহাত'**-এর নির্দেশ রয়েছে। এবং এ দুটোর পরস্পর তুলনা থেকে আমরা এ দলিল পাচ্ছি যে, পাপাচারীদের জন্য পরকালে শাস্তি আবশ্যকীয়, কেননা দুনিয়াতে যেমন দৈহিক পবিত্রতার (অর্থাৎ সুস্থতার) নিয়ম-বিধি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কোন রোগ-ব্যাধিতে পাকড়াও হয়ে যাই, তেমনি এ বিষয়টিও সুনিশ্চিত যে, আমরা যদি রূহানী পবিত্রার নিয়ম-নীতিকে পরিহার বা লঙ্ঘন করি তাহলে সেভাবেই মৃত্যুর পরও ঐ নির্দিষ্ট আযাব আবশ্যকীয়ভাবে আমাদের ওপরে এসে যাবে যা সংক্রামক রোগের ন্যায় আমাদেরই কর্মফল -স্বরূপ হবে।'

এরপর সূরা ইউনুসের ৬০তম আয়াত ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ اٰٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে রিয্‌ক অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে তোমরা নিজেরাই হারাম বা হালাল বানিয়ে নিয়েছ? তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর (অর্থাৎ এ সব করার) অনুমতি দিয়েছেন অথবা তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলছো"?

হযরত নো'মান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'হারাম ও হালাম বস্তু সুস্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা বেশির ভাগ

মানুষ জানে না। অতএব যারা মুশ্‌তাবাহাত (সন্দেহজনক বস্তুগুলো) থেকে বেঁচে চলে তারা তাদের ধর্ম ও ইজ্জত-আব্রুকে বাঁচিয়ে নেয়। আর যে কেউ মুশ্‌তাবাহাতে পড়ে, সে হারামে গিয়ে ফাঁসে। ওরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অবিকল সেই রাখালের ন্যায়, যে নিষিদ্ধ এলাকা (Prohibited Area)-এর কাছাকাছি তার পশুপালকে চরায়। কাজেই সে এলাকায় পশুদের ঢুকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। দেখ! প্রত্যেক বাদশারই একটা নিষিদ্ধ অঞ্চল বিশেষ থাকে। তাতে কারও যাওয়ার অনুমতি নেই। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ এলাকা হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে হারাম ঘোষিত বস্তুগুলো। আর শোন! মানুষের দেহে একটি গোশ্‌তপিন্ড আছে। যদি তা ঠিক থাকে তাহলে সারা দেহ সুস্থ ও ঠিক থাকে। আর যখন ওটা খারাপ হয়ে যায় বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন দেহ অসুস্থ ও অসহায় হয়ে যায়। ভালভাবে মনে রেখো, সে মাংসপিন্ডটি হচ্ছে দিল্ (মানবহৃদয়)।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'কুরআন শরীফ তো **'কুলূ মিনাত্ তাইয়্যাবাত'**-এর শিক্ষা দেয়, আর এ সকল (বেদাত সৃষ্টিকারী) লোক ধূলো ছুঁড়ে দিয়ে ঐসব (পবিত্র) বস্তুকে অপবিত্র বানিয়ে দেয়। এ ধরনের মযহব (ধর্মমত) ইসলামের (সূচনা কালের) অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। এরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর অনেক কিছু বাড়িয়ে যোগ করে যা ইসলাম ও কুরআন করীমের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে। এরা নিজেরা নিজেদের শরীয়ত পৃথক কায়েম করে নেয়। আমি একে অত্যন্ত ঘৃন্য ও হেয়ো দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের রসূল (সঃ) হচ্ছেন 'উস্‌ওয়া-এ-হাসানা'(সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত)। আমরা যেন যথা সম্ভব তাঁরই পদ-চিহ্ন অনুসরণ করে চলি, এর বরখেলাপ এক পা-ও না বাড়াই। এতেই আমাদের মঙ্গল ও সৌন্দর্য রয়েছে।'

সূরাতুন্ নাহ্‌লের ১১৩তম আয়াত ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ এক এমন শহরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যা অতি নিরাপদ শান্ত ও পরিতৃপ্ত ছিল তাতে তার রিয্‌ক পর্যাপ্তভাবে সকল দিক থেকে আসতো। অতঃপর এর অধিবাসীরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজীর প্রতি অকৃজ্ঞতা ও অমর্যাদা করলো। অতএব আল্লাহ্ তাদেরকে যা তারা করতো তার দরুন ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরিয়ে দিলেন।

হযরত সো'বান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'দোয়া ছাড়া এমন কিছু নেই যা আয়ুকে বাড়ায় এবং 'কাযা ও কদর' (নিয়তি)-কে টলায়। সুতরাং মানুষ তার নিজের ভুলের দরুনই বঞ্চিত হয়।'

সূরাতু বনী ইসরাঈলের ৩২তম আয়াত ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿۳۲﴾

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না; আমরাই তাদেরকে রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও; তাদেরকে হত্যা করা নিশ্চয় অনেক বড় পাপ।'

দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে, সন্তান বেশি হয়ে গেলে আমাদের রিয্‌কে টান পড়ে যাবে এই ভয়ে যে ফ্যামিলী প্লানিং করা হয়, তা করা উচিত নয়। আসলে গরীব দেশগুলোর চিকিৎসা বা প্রতিকারই হচ্ছে বেশি সংখ্যায় সন্তান হওয়া। সন্তান বেশি হলে তারা বাইরের দেশে ছড়িয়ে পড়তে ও হিজরত করতে বাধ্য হয়। এতে অনেকখানি আয়-উপার্জন যা বাইরের দেশগুলো থেকে গরীব দেশে আসে তা সন্তান বা জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণেই হয়ে থাকে।

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, সাহাবা কেরাম কোন কোন সময় ফ্যামিলী প্ল্যানিং করে থাকতেন, কিন্তু সন্তান-সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে করতেন না। তাঁরা জানতেন, রিয্‌ক আল্লাহ্‌রই হাতে। অতএব ফ্যামিলী প্লানিং যদি রিযিকের ভয়ে করা না হয় তাহলে এর গোনাহ্ নেই। এর যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু রিযিকের ভয়ে ফ্যামিলী প্লানিং অবশ্যই নিষেধ।

হযরত আনাস বিন' মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'যে চায়, তার রিয্‌কে প্রসারতা দান করা হোক ও আয়ুবৃদ্ধি হোক, তার উচিত সে যেন 'সিলা রেহ্‌মী' (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার) করে।'

এখন, এটি এক নতুন তত্ত্ব, যা আঁ হযরত (সল্লাল্লাহু ...) বর্ণনা করেছেন। 'সিলা রেহ্‌মী'র দিকে মনোযোগ খুবই কম। প্রচুর সংখ্যায় এমন অভিযোগ আসে যেগুলো থেকে জানা যায় যে, 'সিলা রেহ্‌মী' করা হচ্ছে না- কোথাও শ্বাশুড়ীর অধিকার পুত্র-বধূ দিচ্ছে না, আবার কোথাও পুত্র-বধূর অধিকার শ্বাশুড়ী দিচ্ছেন না। মোটকথা, সিলা রেহ্‌মীর অভাব জামাতে এখনও চলছে। আর তারা ভুলে যায় যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যে-কেউ সিলা রেহ্‌মী করবে তার রিয্‌কে আল্লাহ্‌তাআলা বরকত দান করবেন।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, 'এতো বেশি যে, (এর) বড় বড় কারণের মধ্যে পুরুষদের অসদাচরণও রয়েছে তাছাড়া আরেকটি কারণ দারিদ্রের ভয়, যেমন কেউ কেউ বলছেন, অনেক সন্তান-সন্ততি হওয়া উচিত নয়।"

সূরাতুত্তাহার ১৩২ ও ১৩৩তম আয়াত ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿۱۳۲﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۭ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۳﴾

অর্থ ঃ "এবং তুমি তোমার দৃষ্টিকে ঐ সাময়িক মাল-মাত্তার দিকে প্রসারিত করো না যা আমরা তাদের মাঝে কোন কোন শ্রেণীকে পার্থিব সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়েছি, যেন আমরা এতে তাদের পরীক্ষা করি অথচ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (দেয়া) রিয্‌কই সবচেয়ে উত্তম ও স্থায়ী। আর তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের জন্য আদেশ দাও ও তাতে দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধরো; তোমার নিকট আমরা কোন প্রকারের রিয্‌ক চাই না, আমরাই তো তোমাকে রিয্‌ক দেই। আর পরিণাম তাকওয়ারই (শুভ হয়ে থাকে)।" এ আয়াত একেবারে স্পষ্ট। অধিক কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। পুনরায় সাহায্যের জন্য আবেদন করলাম। তিনি পুনরায় দিলেন। তারপর কিছু চাইলাম। তিনি আবারও আমাকে কিছু দিলেন, কিন্তু সেই সাথে বললেন, 'এই ধন-সম্পদ অতি লোভনীয় জিনিস। যে কেউ এর প্রতি লোভ না রেখে নির্লিপ্ত মনে গ্রহণ করে, এতে তার জন্যে বরকত দেয়া হয়। আর যে এটাকে পাওয়ার জন্য লিপ্সা করে তার জন্য ওটাতে বরকত দেয়া হয় না এবং তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়ায় যে কিনা খেতে থাকে কিন্তু তার ক্ষুধা যায় না। মনে রেখো, উপরের হাত নীচের

হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দানকারী হাত সেই হাতের চেয়ে উত্তম, যা গ্রহণ করে।' হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) বলেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর ইরশাদ শুনে তাঁর নিকট নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই পবিত্র সত্তার কসম যিনি সত্য সহকারে আপনাকে পাঠিয়েছেন! ভবিষ্যতে আ-জীবন আমি আপনি ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে কোন জিনিস নিবো না। সুতরাং পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) অনুদান দেয়ার জন্য হাকীম বিন হিযাম (রাঃ)-কে ডাকতেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর হযরত উমর (রাঃ)-ও তাঁকে ডেকে এনে অনুদান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন। তাতে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'হে মুসলমানগণ! আমি আপনাদেরকে হাকীম বিন হিযাম সম্পর্কে সাক্ষী রাখছি, আমি তার সামনে তার সেই প্রাপ্য অধিকার পেশ করেছি যা 'ফায়' (খারাজ বা যুদ্ধ লব্ধ মাল)-এর থেকে আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্য নির্ধারিত করেছেন। তা সে নিতে অস্বীকার করেছে।' মোটকথা, হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম ও উঁচু স্তরের খুশি আল্লাহ্‌তে মেলে, যার নীচে কোন খুশি নেই। (যা আবরণে ঢাকা এমন) গোপনকে জান্নাত বলা হয়। জান্নতকে জান্নাত এজন্য বলা হয় যে, তা নেয়ামতসমূহে ঢাকা রয়েছে। আসল জান্নাত হচ্ছে খোদাতাআলা যাঁর ক্ষেত্রে আদৌ কোন দুঃখ-কষ্ট বা অশান্তি আরোপ হয় না। সেজন্য জান্নাতের পুরস্কারগুলোর মধ্যে **রিযওয়ানুম্ মিনাল্লাহি আক্‌বার** (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়)-কেই রাখা হয়েছে। মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন কষ্ট ও অশান্তির মধ্যে থাকে। কিন্তু সে যত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে থাকে ও **তাখাল্লাকু বি-আখ্‌লাকিল্লাহ্** অনুযায়ী আল্লাহ্‌র গুণাবলীর রঙে রঙিন হয়ে যায়, ততই সুখ ও আরাম পায়। যতটুকু আল্লাহ্‌র নৈকট্য হবে তদনুপাতে খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামত থেকে অবশ্য অবশ্যই অংশ পাবে। আর 'রাফা'-এর অর্থ এটাই বুঝায়।'

সূরাতুল হাজ্জ-এর ৩৬তম আয়াত ঃ

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

অর্থ ঃ '(সুসংবাদ দাও তাদেরকে)" যারা এমন যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) যখন (উঁচু) করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে এবং ঐ দুঃখ-কষ্টের জন্য তারা ধৈর্য ধরে থাকে যা তাদেরকে আঘাত করে এবং তারা নামাযকে কায়েম করে থাকে, আর যা কিছু (রিয্‌ক) আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে।' হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট কিছু খাবার আনতে পাঠালো (এতে লক্ষ্য করুন, সাহাবাদের রীতি এ-ও ছিল যে, খাবার টান পড়লে তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট মানুষ পাঠিয়ে দিতেন যেন তিনি (সঃ) কিছু খাবার পাঠিয়ে দেন। আর আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা যা দান করতেন তা থেকে তিনি অন্যদেরকে দিতেন)। বর্ণনাকারী বলছেন, 'আমি যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর দরবারে পৌঁছলাম তখন তিনি (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনলাম, 'যে কেউ সব্‌র করে তাকে আল্লাহ্ সব্‌র করার তওফীক (সামর্থ্য) দান করেন। যে নির্লোভ ও উদার হ'তে চায় তাকে তিনি নির্লোভ ও উদার করে দেন। আর যে কেউ সতীত্ব রক্ষার নীতি অবলম্বন করে তাকে তিনি নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্বের অধিকারী বানিয়ে দেন। কোন মানুষকে ধৈর্যের চেয়ে বড় এমন কোন রিয্‌ক দেয়া হয় নি যা তার জন্য বেশি প্রাচুর্যের কারণ হয়।'

সুনান ইবনে মাজায় হযরত আবূ আমামা হ'তে বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঈর্ষার যোগ্য মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার বেশী ধন-সম্পদও নেই এবং লোকজনও নেই। ধন-সম্পদের কেবল সামান্য একটা অংশ সে পেয়েছে। মানুষের মাঝে প্রায় অজানা ও অখ্যাতভাবে থাকে। তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। রিয্‌কের দিক দিয়েও তার কেবল কোন রকমে চলে। কিন্তু সে তাতে ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। আর সে শীঘ্র মারাও যায় এবং মরণোত্তর সম্পদও অনেক কম রেখে যায়। তার জন্য কাঁদার লোকও খুব কম সংখ্যক হয়।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, **মিম্‌মা রাযাক্‌নাহুম** হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় 'রুকন'-আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীলতা। অতএব আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-দক্ষতা সবই **মিম্‌মা রাযাকনাহুম**-এর অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যদি কেউ আপত্তি করে, 'মিম্‌মা রাযাক্‌নাহুম' কেন বললেন? 'মিম্‌মা' শব্দ থেকে কৃপণতার গন্ধ আসে। তাহলে আসল কথা হচ্ছে, এ থেকে কৃপণতা প্রমাণিত হয় না। কুরআন করীম হচ্ছে 'হাকীম' (পরম প্রজ্ঞাবান) খোদার বাণী। 'হিকমত'-এর অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা। **মিম্‌মা রাযাক্‌নাহুম** বাণীটিতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্থান -কাল-পাত্র ভেদে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ কর। যেখানে অল্প খরচ করার প্রয়োজন সেখানে অল্প আর যেখানে বেশি খরচ করার প্রয়োজন সেখানে বেশি খরচ কর। অতএব এ হিকমতই রয়েছে **মিম্‌মা রাযাক্‌নাহুম ইউন্‌ফিকূন**-এর মধ্যে। প্রত্যেক মু'মিন তার নিজের জন্য নিজে মুজ্‌তাহিদ' (সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী) হয়ে থাকে। সে স্থান-কাল ও উপলক্ষ্য সনাক্ত করুক ও সমীচীন পরিমাণে খরচ করুক।"

স্মরণ রাখবেন যে, আমরা সবসময় দেখে আসছি যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে হিজরত করে তাদের জীবিকায় অনেক বরকত দেয়া হয়।

সূরা আল্ হাজ্জের ৫৯তম আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

অর্থ ঃ "আর যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে তারপর নিহত হয় বা মারা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই উত্তম রিয্‌ক দান করবেন আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে উত্তম রিয্‌ক দানকারী।'

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলূল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'সকল কাজ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে ও প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যত অনুযায়ী-ই বদলা (ফল) পায়। যে কেউ আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর রসূলের দিকে হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে (গণ্য) হবে। আর যে কেউ দুনিয়ার জন্য বা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকবে তার হিজরতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নিকট ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

সুতরাং আজকাল অনেক আহমদী যারা হিজরত করছেন তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। অনেকে হিজরত করে অর্থের জন্য আর কেউ কেউ বিবাহের উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ আবার আমাকে লিখেও থাকেন, 'আমার ছেলের হিজরত করিয়ে দিন ও তার সেখানে বিয়ে করিয়ে দিন।' অতএব এ সবই ফাল্‌তু ও আজে বাজে কথা। আঁ হযরত (সঃ) এ ব্যাপারে শক্তভাবে সাবধান করেছেন।

সূরাতুল মু'মিনুনের ৭৩তম আয়াত ঃ

أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

অর্থ ঃ 'তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাও? তবে (তারা স্মরণ রাখুক) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান সবচেয়ে উত্তম এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম বিয্কদানকারী।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, "সাহাবা (রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম)-এর একটি জান্নাত ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহচর্য। তারা (তাতে) পাপ ও এর কুফল থেকে বেঁচে গিয়ে পুণ্য ও সৎ কাজের স্বাদ ভোগ করতেন। আরেক বেহেশ্ত হচ্ছে আল্লাহ্তে ভরাসা ও ঈমান যা বিপদাবলীতেও আরাম দেয়। তারপর সাহবা (রিয্ওযানুল্লাহি আলায়হিম)-এর জন্য মদীনা মুনাওয়ারা বেহেশ্ত ছিল অতঃপর মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য বিজয়, যেমন- মিসর, ইরাক ও 'আজম', সিরিয়া এবং ঐ সকল দেশ যাদের সম্পর্কে মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল যে, সেখানে দুধ ও মধুর নদী বয়ে যায়। এবং একটি বেহেশ্ত হচ্ছে কুরআন মজীদ ও এর অকাট্ট যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণ যেগুলোর দ্বারা সকল ধর্মমতের (অসারতার) বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মানুষ সুখী ও পরিতুষ্ট থাকে।"

অতএব, জান্নাতের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে ঐ সবগুলোই হযরত খলীফাতুল মসীহ আউওয়াল (রাঃ) বর্ণনা করে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "বেহেশ্ত সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন **আতায়ান গায়রা মাজ্যূয**- এটি এমন এক নেয়ামত যা কখনও ছিন্ন হবে না। যদি ওরূপই না হতো তাহলে বেহেশ্তে থেকেও মু'মিনদের মনে খটকা বেজে থাকতো পাছে কখন জানি তাদেরকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু এর বিপরীতে দোযখের ক্ষেত্রে ওরূপ নয়। (অর্থাৎ তা বেহেশ্তের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন হবে তা বলা হয় নি- অনুবাদক)। একটি হাদীস থেকে (বরং) প্রমাণিত যে, এমন এক সময় আসবে যখন দোযখ থেকে সবাই বেরিয়ে যাবে (কেউ -ই) আর সেখানে থেকে যাবে না। খোদাতাআলার রহমতও এটাই চায়। যাই হোক না কেন মানুষ তো আল্লাহ্রই সৃষ্টি (মখলুক)। খোদাতাআলা তার দুর্বলতাগুলো দূর করে দেবেন এবং ধীরে ধীরে তাকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দান করবেন।"

হযরত উম্মে সাল্মা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "নবী করীম (সঃ) ফজরের নামাযের পর এই দোয়া চাইতেন ঃ **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্য়ালুকা ইল্মান নাফেয়ান ওয়া আমালাম মুতাকাব্বালান ওয়া রিয্কান তইয়্যেবান'** অর্থাৎ 'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এমন ইল্ম (জ্ঞান)-এর জন্য প্রার্থনা করি যা উপকারী হয় আর এমন আমলের (কর্মের) জন্য, যা (তোমার দৃষ্টিতে) গ্রহণীয় হয় এবং পবিত্র রিয্কের জন্য (তোমার নিকট প্রার্থনা করি)।' আর একটি বর্ণনায় আছে **রিয্কান ওয়াসেয়ান** অর্থাৎ অনেক ব্যাপক রিয্ক।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল। আপনি রাতে যে সকল দোয়া করেন সেগুলোর মধ্যে যা আমি জানতে পেরেছি তা এই যে, আপনি দোয়া করেন ঃ **আল্লাহুম্মাগ্ফির লি যাম্বি ওয়া ওয়াস্সি লি ফি দারী ওয়া বারেক লি ফিমা রাযাক্তানী**। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার গোনাহ্ ক্ষমা কর, আমার জন্য আমার ঘর প্রশস্ত করে দাও এবং যে রিয্ক তুমি আমাকে দিয়েছ তাতে বরকত দান কর। দোয়া শুনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তুমি কি মনে কর এই দোয়াতে এমন কোন কিছু ছেড়ে দিয়েছো যা তোমার চাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তুমি তা চাও নি?'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'যাকে আল্লাহ্ কোন কিছু খাওয়ান তার উচিত সে যেন এ দোয়া করে ঃ **আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুনা খায়রাম্ মিন্হু** - (হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর ও এর চেয়েও উত্তম রিয্ক দান কর)। এবং যাকে আল্লাহ্তাআলা দুধ পান করান তার উচিত সে যেন এ দোয়া করে ঃ **আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদ্না ফীহি ফা-ইন্নী লা আ'লামু মা ইর্যী মিনাত্ ত্বাআ'মি ওয়াশ্ শারাবি ইল্লাল্ লাবান**-(হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর ও এথেকে আরও দাও, কেননা নিশ্চয় দুধ ব্যতীত অন্য এমন কোন খাবার বা পানীয় সম্বন্ধে আমার জানা নেই যা পরিপূর্ণ খাদ্যরূপে আমার জন্য সন্তোষজনক হতে পারে)।

আজকের চিকিৎসাবিদরাও অনেক গবেষণার পর এ কথা আবিস্কার করেছেন যে, দুধের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ খাদ্য অন্য কোন কিছু নেই। এটা তো সুস্পষ্ট হয়, শিশু শুধুমাত্র দুধ পান করে থাকে। তাতে চোখ ইত্যাদি তৈয়ার হয়, তার মস্তিষ্ক ও তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ লিভার, কিড্নী সবই এ দুধের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্তাআলার এটা এক বিশেষ মহিমা যে, দুধ বড়ই এক পরিপূর্ণ খাদ্য। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও একে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আজকাল বিজ্ঞানীরা বলেন, যারা শৈশবে মায়ের দুধ খায় নি তাদের শরীরে এমন অপূরণীয় অভাব থেকে যায় যা মিটাতে তাদের জন্য দুধ ছাড়া পরিপূরক খাদ্য হতে পারে না। শরীরে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিরোধের শক্তিও তার দরুন সৃষ্টি হয়ে যায় যা মায়ের দুধে রয়েছে। অতএব দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য যার মাধ্যমে মানুষকে অনেকখানি রিয্ক দান করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'কুরআন করীম থেকে আমার কোন কিছু স্মরণ থাকে না, আমাকে এমন কোন বিষয় বলে দিন যা তার বিকল্পস্বরূপ হতে পারে।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'এ কথাগুলো আবৃত্তি করবে ঃ **সুবহানাল্লাহ্ আলহাম্দুলিল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্**। তাতে আমি বল্লাম, 'একথাগুলো তো আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্য হলো; আমার জন্য কী?' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তোমার নিজের জন্য এ দোয়া করো ঃ **আল্লাহুম্মার হাম্নি ওয়ার যুক্নি ওয়া আফিনি ওয়াহ্দিনি**- "(হে আমার আল্লাহ্! আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে রিয্ক দাও, আমাকে সুস্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ দাও এবং হেদায়াত দান কর)"।

হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'প্রত্যেক সেই মুসলমান, যে তার বাড়ী থেকে সফর বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয় আর বেরুবার সময় দোয়া করে ঃ **বিস্মিল্লাহি আমান্তু বিল্লাহে ওয়া তওয়াক্কাল্তু আলায়হে ওয়া লা হওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্** (আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্তে আমি বিশ্বাস এনেছি আর তাঁর ওপরে ভরসা করেছি, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতিরেকে কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই), তাহলে অবশ্য অবশ্যই তাকে তার সফরের বরকত ও কল্যাণ দান করা হয় ও তার সফরের সংকটাবলী তাথেকে দূর করে দেয়া হয়।"

এখন এ সংক্ষিপ্ত খুতবা এখানেই শেষ করছি। অনেকগুলো দীর্ঘ রিওয়ায়াত ছেড়ে দিয়েছি তবু আগামী খুত্বার জন্য বিষয়-বস্তু এখনও বাকী রইলো।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৩-১১-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রথম প্রশ্ন ঃ সূরা মুয্যাম্মেল-এ আছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝

হুযূর দয়া করে এ আয়াতসমূহের একটু তফসীর বর্ণনা করুন। সাধারণ মুসলমানের জন্যও কি এই আদেশ প্রযোজ্য?

(মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহের বাংলা অনুবাদ পেশ করলেন ঃ হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! তুমি রাত্রে (ইবাদতের জন্য) দন্ডায়মান হও অল্প অংশ ব্যতীত, ইহার অর্ধেক অংশ অথবা ইহা হইতে কিছু কম কর, অথবা ইহার উপর কিছু বাড়াও তরতীব সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, আদেশটা মহানবী (সঃ)-কে দেয়া হয়েছিল কিন্তু সবারই চেষ্টা করা উচিত এটাকে পালন করার। বছরের বিভিন্ন সময় দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য ছোট বড় হয়। যখন রাত বড় হয় তখন মহানবী (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে তাহজ্জদ নামায পড়ার আর যেই ঋতুতে রাত ছোট হয় তখন কম সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জদ পড়ার। হুযূর বলেন, প্রত্যেক মুসলমানকে এভাবে তাহাজ্জদ নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত তবে মহানবী (সঃ)-এর মতন করে পড়া ফরযও নয়, প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবও নয়।

২য় প্রশ্ন ঃ বিকল্প শক্তি (ENERGY) সম্বন্ধে হুযূরের মতামত কী ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, বিকল্প শক্তির উপর গবেষণা করা খুবই জরুরী। সৌর শক্তি বা অন্যান্য শক্তি আমাদের জন্য সহজ লভ্য হ'তে হবে। এর ফলে পরিবেশ দুষণ হ্রাস পাবে। সৌর শক্তিতে কোন দুষণ নেই এবং এর প্রাপ্তি ও স্থায়ী হবে। যদি একটা (SOLAR CELL)-এর CHARGE নিঃশেষ হয়ে যায় তো সেটাকে আবার CHARGE করা সম্ভব হয়। আজকাল জাপান এবং ইটালীতে এ বিষয়ে জোর গবেষণা চলছে। আমি একবার রাবওয়াতে আমার খামারে একটা সৌরশক্তি চালিত GENERATOR বসিয়েছিলাম। জানি না ওটা এখনও চালু আছে কি নেই। কিন্তু যখন আমি ওটা চালু করেছিলাম তখন খুবই ভাল ফল পেয়েছিলাম। সমস্যা হচ্ছে যে, সৌরশক্তি যখন উৎপন্ন হ'তে থাকে তখন এর দাম খুবই কম হয় কিন্তু প্রথমবার যন্ত্রটা বসাবার সময় বড় রকম বিনিয়োগ করতে হয়। হুযূর বলেন, আফ্রিকা মহাদেশে আমাদের জামাত যেখানে যেখানে আছে তাদের সৌরশক্তির ব্যবহারে মনোযোগ দেয়া উচিত।

৩য় প্রশ্ন ঃ হুযূর রমযান মাসে অসুস্থ ও মুসাফীরগণকে রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কিন্তু আজকাল সফর বেশি কষ্টের হয় না এজন্য কি সফরে রোযা রাখা বৈধ হবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন। অনেক সময় উড়োজাহাজে ভ্রমণ করলেও এ করম ক্লান্তি হয় যাকে JET-LAG বলা হয়, অবশাদ হয়। অর্থাৎ অনেক রকম সমস্যা হ'তে পারে। অসুখ হলে তো মানুষ নিজেই বুঝতে পারে তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব হবে কি হবে না। আর একটা জিনিষ হচ্ছে DEHYDRATION অর্থাৎ শরীরের পানি শূন্যতা। পেশাওয়ারে এতই কড়াকড়ি করা হয় যে, কোন লোকের পানি শূন্যতা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য তার মুখের ভেতরে মাটির ঢেলা ঢোকানো হয়। মাটি যদি শুকনো থাকে তখনই কেবল গোঁড়া মৌলভীরা স্বীকার করে যে, সে লোক রোযা ভাঙ্গতে পারে। আপনাকে এসব ব্যাপারে ফতোয়া নেয়ার দরকার নেই। সাধারণ জ্ঞান-COMMON-SENSE ব্যবহার করুন।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতনের পর তালেবানরা তাদের সম্পত্তি ফেলে চলে গেছে। সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির কী হবে? এ বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কাবুলের পতনের পর যারা রয়ে গেছেন তাদেরকে বর্তমান আফগান সরকার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সাহায্য দিচ্ছে কিন্তু কিছু পাষন্ড নেতা কিছু লোককে শহর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। এ ধরনের বিতাড়িত লোকেরা পাহাড়ে বা গুহায়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তারাও নিজেদের লোক পাঠিয়ে শহর থেকে গোপনে খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় করতে পারছে। তাদের কাছে টাকার কোন অভাব নেই।

৫ম প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা মুয্যাম্মেলের ৭নং আয়াতে আছে।

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

(সূরাতু মুয্যাম্মেল ঃ ৭)

অর্থ ঃ নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী। দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যেমনটা আমি বলেছি রাতের বেলায় নিভৃতে তাহাজ্জদ নামায পড়লে নিজের আমিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উত্তম উপায়। তখন আপনি যে দোয়া করবেন সেটি আপনার মনের গভীর থেকে বের হবে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, রমযান মাসে ইফতারীর পরে খুব অল্প খেয়ে প্রথমে নামায পড়ে নেয়া উচিত এবং তারপর পূর্ণাঙ্গভাবে খাবার খাওয়া উচিত। হুযূর কি বলেন ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, এটা ভাল পদ্ধতি। ইফতারের সময় একটা দু'টো খেজুর খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গিয়ে বা অন্য স্থানে নামায পড়ে তারপর রীতিমত খাবার খাওয়া ভাল।

৭ম প্রশ্ন ঃ হুযূর এখন রমযান মাস চলছে কিন্তু আফগানিস্তানে লড়াই চলছে। আপনি কি মনে করেন রমযান মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রমযান মাসে যুদ্ধ হারাম নয়। এটাও সত্য যে বদরের যুদ্ধ রমযান মাসেই হয়েছিল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যদি মুসলমানদের উপর অমুসলমানেরা রমযান মাসে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তো নিজেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ তো করতেই হবে। আমেরিকাও তো বলতে পারে যে, তাদের উপর সন্ত্রাসীরা যেভাবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে হঠাৎ হামলা করেছিল এজন্যই তাদের আত্মরক্ষার জন্য এ যুদ্ধ তাদের করতে হচ্ছে। মনে হয়

আমেরিকা তালেবানদেরকে স্তম্ভিত করার জন্যই এত দ্রুত এ যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। তালেবানরা হয়ত মনে করেছিল আমেরিকা রমযান মাসে তাদের উপর আক্রমণ করবে না। আমেরিকা অত্যন্ত দ্রুত হামলা করে। এখন তো প্রায় অর্ধেক আফগানিস্তান থেকে তালেবানদের হটিয়ে দিয়েছে।

৮ম প্রশ্ন ঃ তালেবান সরকারের পতনের পর পরবর্তী সরকারের রূপরেখা কী রকম হওয়া উচিত।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পশ্চিমা শক্তিগুলো এক রকম বলছে। রাশিয়া এক রকম বলছে কিন্তু রাশিয়ার কথাই শেষ কথা হবে না কারণ রাশিয়া তো আফগানিস্তানে পরিবর্তন আনতে কোন ভূমিকাই রাখে নি। এজন্য যেসব শক্তি যুদ্ধ করে তালেবানদেরকে পরাজিত করেছে তাদের কথা মত কাজ হবে। তারা বলছে, আফগানিস্তানে এমন একটি নতুন সরকার কায়েম করবে যাতে সকল মতামতের প্রতিনিধিত্ব থাকবে অর্থাৎ একটি BROAD - BASED সরকার আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখনও বলা কঠিন কী ধরনের সরকার গঠিত হবে। তারা এমন একটা ব্যবস্থা করবে যেন তালেবানরা আর কোন দিন ক্ষমতার ধারে কাছেও না আসতে পারে।

৯ম প্রশ্ন ঃ ইফতারের জন্য সব চাইতে উত্তম খাদ্য কোন্‌টি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অনেক রকম খাদ্য-দ্রব্যই লোকে ব্যবহার করে থাকে। কেউ সেমাইকে ভাল মনে করে, কেউ দইকে বেশি পসন্দ করে। বাংলাদেশে তো আমার মনে হয় মিষ্টি দই-এর প্রচলন তুলনা - মূলকভাবে বেশি, আবার টক দইও আছে। আমি মিষ্টি দই পসন্দ করি। দইকে এমন করে জমানো উচিত যেন টক্ ভাবটা সৃষ্টি না হ'তে পারে। আর যদি দই না পাওয়া যায় তো অন্য জিনিষ ইফতারের জন্য পাওয়া যায় ওগুলো আপনারা খেতে পারেন। যা-ই আপনি পান ওটা দিয়ে রোযা ইফতার করা যাবে।

১০ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা কোন্ জিনিস্ সব চাইতে বেশি পসন্দ করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তো কিছুই খান না এজন্য তাঁর সব চাইতে পসন্দের কোন খাদ্য-দ্রব্য তো নেই। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে আনুগত্যকে সব চাইতে বেশি ভালবাসেন। এটা তো মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। আপনার মা ঐ সন্তান বা সন্ততিকেই বেশি ভালবাসবে, যে তাঁর বেশি অনুগত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকেই ভালবাসেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পালন করে।

১১তম প্রশ্ন ঃ হুযূর নিজের সন্তানকে ত্যাজ্য করা কি ইসলাম বৈধ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আগেকার দিনে এরকম একটা রীতি ছিল যে, যদি কারও ছেলে মা-বাপের ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশ না মানতো ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হতো। ত্যাজ্য করণ বা উর্দূতে 'আক' করা বলা হ'ত। কিন্তু এরকম ঘটনা খুবই কম হয়। এক সন্তানকে তার বাবার সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা খুবই বড় শাস্তি। আজকাল এটা করা হয় না।

১২তম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তো সামী ও বাসীর তাই ফিরিশ্‌তাগণের দরকার কী ছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলার কর্মচারী হিসাবে ফিরিশ্‌তাগণ কাজ করে যাবেন যেমন একটি রাজ্যে রাজা নিজের আজ্ঞাবাহক দ্বারা কাজ করিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলাই ফিরিশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করছেন এবং কে কোন্ কাজটি করবে তার প্রশিক্ষণ তাদেরকে দিয়েছেন। এখন এ বিরাট বিশ্ব-জগৎ তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে চলছে এবং নিজের কর্মচারী ফিরিশ্‌তাগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা সব খবরা-খবর নিয়মিতভাবে পাচ্ছেন।

১৩তম প্রশ্ন ঃ আহমদীয়ত্ চিরস্থায়ী হবে কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যার উত্থান আছে তার পতনও হয়। সূর্য সকালে উঠে এবং সন্ধ্যার সময় অস্ত যায়। এটা প্রকৃতির নিয়ম এবং আল্লাহ্‌তাআলা নিজে এ নিয়ম বানিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস দেখুন কত উন্নতি করেছিল মুসলমানেরা, কিন্তু আবার মুসলমানদের পতনও হ'ল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সঃ)-এর পরে যখন এক সময় মুসলমানদের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরাও মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে মহানবী (সঃ) এরই দাস, এ জন্য একথা বলা যায় যে, এক সময় হয়তো আহমদীয়ত-এরও অধঃপতন হবে।

১৪তম প্রশ্নঃ জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক বৎসর রমযান মাসে মহানবী (সঃ)-কে একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়াতেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনেও কি এরকম কোন ঘটনা হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে এ রকম কোন ঘটনা ঘটে নি। আসল ব্যাপার হচ্ছে পবিত্র কুরআন মহানবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। তিনি যেন এ বাণীকে সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন এবং অন্য মুসলমানদের শিখাতে পারেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল যে, হযরত জিব্‌রাঈল প্রত্যেক রমযান মাসে মহানবী (সঃ)-কে কুরআন আবার শুনাবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এ রকম কোন প্রয়োজন ছিল না।

[এই পর্যায়ে বাঙ্গালী মেয়ে শওকাত্ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটি উর্দূ নযম আবৃত্তি করে শোনান এবং মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব তার বঙ্গানুবাদ পেশ করেন]।

১৫তম প্রশ্ন ঃ হুযূর রমযান শব্দের অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রাম্‌য-এর অর্থ গরম উষ্ণতা রমযান-এর অর্থ হচ্ছে দু'ধরনের উষ্ণতা। এক উষ্ণতা হচ্ছে পরিবেশ-এর তাপ, অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার প্রেমের উষ্ণতা।

১৬তম প্রশ্ন ঃ একটি বালিকা হুযূরকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোন্ বয়সে রোযা রাখতে আরম্ভ করেছিলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ খুবই অল্প বয়সে প্রথম ছোট করে রোযা রাখতে শুরু করি অর্থাৎ পাখির মত করে। সকালে সেহরী খেয়ে দুপুরে ইফতার করে ফেলতাম, আবার দুপুর থেকে বিকালের নাস্তা পর্যন্ত আর একটা ছোট রোযা রাখতাম তারপর বিকেল থেকেই ইফতার পর্যন্ত আবার রোযা রাখতাম। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার রোযার সময়টাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয়-দশ বছর থেকে আমি রোযার মাসে একবার কি দুইবার পুরাটি দিন রোযা রাখতে শুরু করি। যখন আমার বয়স ১২ বৎসর হ'ল তারপর থেকে রমযান মাসে পুরা মাস রোযা রাখতে আরম্ভ করি।

সংকলন ও অনুবাদ-নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(অষ্টম কিস্তি)

সূরাতুল বাকারাহ্-২

(৮১) ওয়া কালূ লানতামাস্সানা আন্নার
এবং তারা বলে অবশ্যই আমাদেরকে ছুঁবে না আগুন

ইল্লা আয়ায়্যামান মা'দূদাতান কুল আত্তাখাযতুম
ছাড়া দিন গণার তুমি বলে দাও তোমরা কি নিয়ে নিয়েছো

'ইনদাল্লাহি 'আহদান ফালাঁইউখলিফাল্লাহু
আল্লাহ্র কাছে থেকে কোন অঙ্গীকার তা হলে কখনও অন্যথা করবেন না আল্লাহ্

'আহদাহূ আম তাকূলূনা 'আলাল্লাহি
তাঁর অঙ্গীকার বা/কি তোমরা বলো আল্লাহ্র বিরুদ্ধে

মা লাতা'লামূন। (৮২) বালা মান কাসাবা
যা তোমরা জান না কেন নয় যে অর্জন করেছে

সাইয়্যিয়াতান ওয়া আহাত্বত বিহী খত্বীয়াতুহূ
মন্দ এবং ঘিরে নিয়েছে তাকে তার দোষ-ত্রুটি

ফাউলাইকা আসহাবুন্নার হুম ফীহা খালিদূন
সুতরাং এরা আগুনের অধিবাসী তারা এতে চিরকাল থাকবে।

(৮৩) ওয়াল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমিলুস্ সলিহাতি উলাইকা
আর যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কাজ করেছে এরাই

আসহাবুল জান্নাত হুম ফীহা খালিদূন (৮৪) ওয়া ইয্
জান্নাতের অধিবাসী এতে তারা চিরকাল থাকবে এবং (স্মরণ করো) যখন

আখাযনা মীসাক্ব বানী ইসরাঈলা
আমরা নিয়েছিলাম পাক্কা অঙ্গীকার বনী ইসরাঈল

লাতা'বুদূনা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া বিল ওয়ালিদায়নি
তোমরা উপাসনা করো না আল্লাহ্ ছাড়া এবং মা-বাবার প্রতি

ইহসানাস ওয়া যিল্ কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীন
অনুগ্রহ (করবে) এবং নিকটাত্মীয় এবং এতীম এবং অভাবী

ওয়া কূলূ লিন্নাসি হুসনান ওয়া আক্বিমূ
এবং তোমরা বলো মানুষের সাথে উত্তম কথা এবং তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো

আস্ সালাত ওয়া আতূ আয্যাকাত সুম্মা তাওয়াল্লায়তুম
নামায আর তোমরা দাও যাকাত অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে

ইল্লা ক্বলীলান মিনকুম ওয়া আনতুম মু'রিযূন
ছাড়া অল্প তোমাদের মধ্যে এবং তোমরা তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে

(৮৫) ওয়া ইয্ আখাযনা মীসাক্বকুম
এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা নিয়েছিলাম তোমাদের পাক্কা অঙ্গীকার

লাতাসফিকূনা দিমায়াকুম ওয়ালা তুখরিজূনা আনফুসাকুম
প্রবাহিত করবে না তোমাদের রক্ত এবং বের করবে না নিজেদের লোকদেরকে

মিন দিয়ারিকুম সুম্মা আক্বরারতুম ওয়া আনতুম
তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে এরপরে তোমরা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা

তাশহাদূন (৮৬) সুম্মা আনতুম হাউলাই তাক্বতুলূনা
তোমরা সাক্ষী থাকবে এরপর তোমরা এরাই যারা হত্যা করে থাক

আনফুসাকুম ওয়া তুখরিজূনা ফারিক্বমমিনকুম
নিজেদের লোকদেরকে এবং বের করে থাক তোমাদের মধ্যে এক দলকে

মিন দিয়ারিহিম তাযাহারূনা আলায়হিম
তাদের ঘর-বাড়ী থেকে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করতে তাদের বিরুদ্ধে

বিল ইসমি ওয়ালউদওয়ান ওয়া ইন ইয়্যা'তূকুম
পাপের সাথে এবং সীমালঙ্ঘন করে আর যদি তারা তোমাদের কাছে আসে

উসারা তুফাদূহুম ওয়া হুয়া মুহাররামুন
কয়েদী (হয়ে) তোমরা ফিদিয়া দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নাও আর ইহা নিষিদ্ধ

আলায়কুম ইখরাজুহুম আফাতু'মিনূনা
তোমাদের জন্যে তাদের বের করা তবুও কি তোমরা ঈমান আনবে

বিবা'যিন আল্ কিতাব ওয়া তাকফুরানা
এক অংশ কিতাব এবং তোমরা অস্বীকার করো

বিবা'যিন ফামা জাযাউ মাঁইয়াফ'আলু যালিকা
এক অংশ অতঃপর নয় এর প্রতিফল যে করেছে বা করে এরূপ

মিনকুম ইল্লা খিযইউন ফিল হায়াতিদ্দুনয়া
তোমাদের মধ্যে ছাড়া লাঞ্ছনা ইহ জীবনে

ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইউরাদ্দুনা ইলা
আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দিকে

আশাদ্দিল 'আযাব ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন
কঠিনতর শাস্তি এবং আল্লাহ্ নন অমনোযোগী

আম্মা তা'মালূন (৮৭) উলাইকা আল্লাযীনা
তাথেকে যা তোমরা করো এরাই যারা

ইশতারু আল্ হায়াতিদ্দুনয়া বিল আখিরাতি
ক্রয় করে ইহ জীবন পর জীবনের বদলে

ফালাঁইউখাফ্ফাফু 'আনহুম আল্ 'আযাব ওয়ালা-হুম
অতএব না কমানো হবে তাদের থেকে শাস্তি এবং না তাদের

ইউনসারূন (৮৮) ওয়ালাক্বদ আতায়না
তাদের সাহায্য করা হবে এবং নিশ্চয় আমরা দিয়েছিলাম

মূসা আল্ কিতাব ওয়া কাফ্ফায়না
মূসা (আঃ) কিতাব, গ্রন্থ, পুস্তক এবং আমরা অনুসরণে পাঠিয়েছিলাম

মিম বা'দিহী বিরুসুলি ওয়া আতায়না
এর পরে রসূলগণকে আর আমরা দিয়েছিলাম

'ঈসাবনা মারইয়াম আল্ বায়্যিনাতি ওয়া আইইয়্যাদনাহু
মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম

বিরূহিল কুদুস আফা কুল্লামা জায়াকুম
পবিত্র আত্মা দ্বারা অতএব কি যখনই তোমাদের নিকট এসেছে

রসূলুন বিমা লাতাহ্ওয়া আনফুসুকুম
কোন রসূল যা না তোমরা চাইতে তোমাদের আত্মা

ইসতাকবারতুম ফা ফারিকান কায্যাবতুম
তোমরা গর্ব করতে অতঃপর একদল তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলে

ওয়া ফারিকান তাক্বতুলূন ওয়া কালূ
এবং এক দল তোমরা হত্যা (করতে চেষ্টা) করতে এবং তারা বল্লো

কুলূবুনা গুলফুন বাল লা'আনাহুমুল্লাহু
আমাদের হৃদয় পর্দায় ঢাকা বরং আল্লাহ্ তাদের ওপরে অভিসম্পাত করলেন

বিকুফরিহিম ফাক্বালীলাম্মা ইউ'মিনূন
তাদের অস্বীকার করার কারণে সুতরাং তারা কমই ঈমান আনে

(৯০) ওয়া লাম্মাজায়াহুম কিতাবুম্মিন 'ইনদিল্লাহি
এবং যখন তাদের কাছে আসলো আল্লাহ্র নিকট থেকে কিতাব

মুসাদ্দিকুন লিমা মা'আহুম ওয়া কানূ মিন ক্ববলু
সত্যায়নকারী যা ছিলো তাদের কাছে আর ছিলো এবং পূর্বে

ইয়াসতাফতিহূনা 'আলাল্লাযীনা কাফারু
তারা বিজয় চাচ্ছিলো তাদের বিরুদ্ধে যারা তারা অস্বীকার করেছে

ফালাম্মা জায়াহুম মা 'আরাফূ
অতঃপর যখন তাদের নিকট (কিতাব) আসলো যাকে তারা চিনে নিলো

কাফারুবিহী ফালা'নাতুল্লাহ্ 'আলাল কাফিরীন
তারা তাকে অস্বীকার করলো অতএব আল্লাহ্র অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের ওপরে

(৯১) বি'সামা ইশতারাও বিহী আনফুসাহুম
তা কতই না মন্দ যা তারা বিক্রয় করেছে নিজেদের প্রাণ

আঁইয়াফফুরু বিমা আনযালাল্লাহু বাগইয়ান
যেন তারা অস্বীকার করে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন বিদ্রোহবশতঃ

আঁইউনায্যিলাল্লাহু মিন ফাযলিহী 'আলা
যেন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন তাঁর অনুগ্রহে ওপরে

মাঁ ইয়াশাউ মিন 'ইবাদিহী ফাবাউ বিগাযাবিন
যাকে চান তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতঃপর তারা ফিরে ক্রোধ নিয়ে

'আলা গাযবিন ওয়া লিল কাফিরীনা 'আযাবুম্ মুহীন
ক্রোধের ওপরে আর অস্বীকারকারীদের জন্যে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(নবম কিস্তি)

♦ হযরত আম্মার (রাঃ) ইবনে ইয়াসীর বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে নামাযে এ দোয়াগুলো পাঠ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ ،وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضٰى وَالْغَضَبِ،وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى،وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ،وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ،وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ،وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ،اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ،وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ- (نسائی کتاب السہو)

(আল্লাহুম্মা বিইলমিকাল গয়বি ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খলক্বি আহ্ইনী মা 'আলিমতাল হায়াতা খয়রাল্লী ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা 'আলিমতাল ওয়াফাতা খয়রাল্লী আল্লাহুম্মা আসআলুকা খশইয়াতাকা ফিল গয়বি ওয়াশ্শাহাদাতি ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফির্‌রিযা ওয়াল গযাবি ওয়া আসআলুকাল ক্বসদা ফীল ফাক্বরি ওয়াল গিনা-ওয়া আসআলুকা না'ঈমাল্লা ইয়ানফাদু ওয়া আসআলুকা ক্বুররাতা আনঈনিল্লা তানক্বত্বি'উ ওয়া আসআলুকার্ রিযা বা'দাল ক্বযা ওয়া আস আলুকাল বারদাল 'আয়শি বা'দাল মাওতি ওয়া আস্আলুকা লাযযাতান্‌নাযারি ইলা ওয়াজহিকা-ওয়াশ্শাওক্বা ইলা লিক্বাইকা ফি গয়রি যার্‌রায়া মুযির্‌রাতিন ওয়ালা ফিতনাতিন মুযিল্লাতিন-আল্লাহুম্মা যাইয়ান্না বিযীনাতিল 'ঈমানি ওয়াজআলনা হু'দাতাম্মুহতাদীন - নিসাই, কিতাবুস সাহূ)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার অদৃশ্যের ওপরে তোমার জ্ঞান ও নিজের সৃষ্টির প্রতি তোমার শক্তি ও মহিমার দোহাই, আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাখো যখন পর্যন্ত জীবিত রাখা তোমার জ্ঞানে আমার জন্যে ভাল হয়। আর আমাকে ঐ সময় মৃত্যু দাও যখন তোমার জ্ঞানে আমার মৃত্যু আমার জন্যে ভাল হয়। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট থেকে দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্বাবস্থায় তোমার ভয় কামনা করছি। আর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সব অবস্থায়ই তোমার নিকট সত্য কথা বলার সৌভাগ্য কামনা করছি। এবং তোমার নিকট থেকে দারিদ্র ও ঐশ্বর্যের অবস্থায় মিথ্যাচার অবলম্বন না করার প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট এমন কল্যাণ চাই যা কখনও নিঃশেষ হবে না। আর চোখের এমন স্নিগ্ধতা চাই যা কখনও শেষ হবে না। আমি তোমার নিকট নিয়তির বিধানের ওপরে সন্তুষ্ট থাকার দোয়া করছি আর এ-ও চাই যে, মৃত্যুর পরে আমাকে স্বস্তিপূর্ণ জীবন দান করা হয় এবং আমি তোমার কাছেই তোমার মুখ দেখার স্বাদ ও তোমার সাথে সাক্ষাতের শখের প্রত্যাশা করছি যেন বিনা দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষায় পথ-ভ্রষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে আমাকে এ কল্যাণ দেয়া হয়। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সাজিয়ে দাও আর আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও।

দুয়ায়ে কুনূত

♦ হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিতর নামায পড়ার জন্যে এ দোয়া কুনূত শিখিয়েছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ.اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ-

(ترمذی کتاب الوتر وابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ)

(আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা ওয়া আফিনী ফীমান 'আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারিকলী ফীমা আ'ত্বায়তা ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা ক্বযায়তা ফা ইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইউক্বযা 'আলায়কা ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাওওয়ালায়তা ওয়ালা ইয়া'ইয্যু মান 'আদায়তা তাবারকতা রব্বানা ওয়া তা'আলায়তা সল্লাল্লাহু আলান্নাবীয়্যি- তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সলাহ্)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যাথেকে তুমি সঠিক পথ দেখাও তাথেকে আমাকে সঠিক পথ দেখাও। আর বিশেষ সুস্থতার ব্যবস্থাপনায় যাথেকে তুমি সুস্থতা দান করবো তাথেকে আমাকে সুস্থতা দান করো। এবং আমাকে বন্ধু বানিয়ে নাও এমন বন্ধু যাদেরকে তুমি স্বয়ং বন্ধু বানিয়ে থাকো। আর যা কিছু তুমি দাও তাতে আমার জন্যে কল্যাণ বর্ষণ করো। অতএব নিশ্চয় তুমি মীমাংসা করো আর তোমার বিরুদ্ধে কোন মীমাংসা করা যেতে পারে না এবং যে তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নেয় সে লাঞ্ছিত হয় না আর যে তোমার সাথে শত্রুতা করে সে সম্মান পায় না। তুমি কল্যাণের অধিকারী, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি বড়ই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে।

♦ হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, জিব্‌রাঈল নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

(تحفۃ الذاکرین، باب صلوٰۃ الوتر مطبوعہ دمشق)

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়া নাততাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলায়কা ওয়া নুসনী 'আলায়কাল খয়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইঁয়্যাফ জুরুকা-আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু- ওয়া ইলায়কা নাস'আ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজূ রহমাতাকা ওয়া নাখ্‌শা 'আযাবাকা ইন্না 'আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব-তুহ্‌ফাতুল ফুফাহা বাবুস্ সালাতিল বিত্‌র, দামেস্কে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আর তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তোমার ওপরে ঈমান আনি ও আমরা তোমার ওপরে ভরসা করি, আমরা উত্তমভাবে তোমার গুণগান করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি আর তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদা করি ও তোমারই দিকে দৌড়াই ও তোমার কাছেই দাঁড়াই আর তোমারই করুণা প্রত্যাশা করি এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপরে আপতিত হয়। (টীকা ঃ কথায় সামান্য পরিবর্তনসহ এ বিখ্যাত দোয়া এসব গ্রন্থে পাওয়া যায় ঃ মারাসিল আবূ দাউদ, বায়হাকী, শরাহুস্ সুন্নাহ্ ও কিতাবুল বিত্‌র শেখ মুহাম্মদ বিন মরাল মারোযী)

নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে দোয়া

♦ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হযরত সওবান (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী নামাযের পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তিন বার **'আস্তাগফিরুল্লাহ্'** পড়ে এ দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ،تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ (مسلم كتاب المساجد)

(আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম- মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার নাম শান্তি, তোমার কাছ থেকেই শান্তি। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী তুমি বড়ই কল্যাণমন্ডিত।

♦ হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ্ বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নামাযে সালাম ফিরানোর পরে ৩ বার এ কথা পড়তেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আধিপত্য ও প্রশংসা তাঁরই আর তিনি সব কিছুর ওপরে (যা তিনি চান) সর্বশক্তিমান। এর পরে তিনি (সঃ) এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (بخاری كتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বয়তা ওয়া লা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু- বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার দান কেউ রুখে রাখতে পারে না। আর যা তুমি রুখে দাও তা কেউ দান করতে পারে না। আর কোন বুযূর্গের বুযূর্গী তোমার মোকাবেলায় কোন উপকার পৌঁছাতে পারে না।

তসবীহ (মাহাত্ম্য ঘোষণা) তাহমীদ (প্রশংসা করা)

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। কয়েকজন গরীব মুহাজির সাহাবা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, ধনী ও বিত্তশালীগণ নামায রোযার সাথে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে আমাদের চেয়ে পুণ্যের পথে আগে বেড়ে যাচ্ছেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই কথা বলবো না যাতে তোমরাও তাদের সমান সমান হয়ে যাও। আর ঐসব লোকদের চেয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাও যারা তোমাদের পরে আসবে। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি (সঃ) বল্লেন, প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার **সুবহানাল্লাহ্** (আল্লাহ্ পবিত্র) ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) এবং ৩৩ বার **আল্লাহু আকবর** (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) পড়া। অন্য বর্ণনায় ৩৪ বার **আল্লাহু আকবর** পড়ার কথা আছে (মুসলিম, কিতাবুস্ সলাত)

♦ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) সকালের নামায পড়ে বসে বসে যিক্‌রে ইলাহী করছিলেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে আসলেন। তখন সূর্য অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলো। হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) তখনও যিক্‌রে ইলাহী করেছিলেন। তিনি (সঃ) বল্লেন, যখন আমি তোমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি ৪টি কথা ৩ বার পড়েছি যা প্রতিদান ও পুণ্যে তোমার এ যিক্‌র থেকে অনেক বেশি ভারী। পুনরায় তিনি (সঃ) বল্লেন, আমি এটা পড়েছিলাম।

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ۔

(مسلم كتاب الذكر)

(সুবহানাল্লাহি আদাদা খলক্বিহী সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহী সুবহানাল্লাহি যিনাতা 'আরশিহী সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী - মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ততটা পবিত্র যতটা তাঁর সৃষ্টি রয়েছে- আল্লাহ্ ততটা পবিত্র যতটা তাঁর পবিত্র সত্তা এ কথা পসন্দ ক'রে থাকেন। আল্লাহ্ পবিত্র ততটা যতটা তাঁর আরশের ওজন (অর্থাৎ সীমাহীন)। আল্লাহ্ পবিত্র ততটা যতটা তাঁর কথা-বার্তা লিখতে কালির প্রয়োজন হয়।

♦ হযরত আবূ সাইয়্যেদ খুদরী (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর জন্যে ৪টি কথা বাছাই করে নিয়েছেন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ ،اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ،لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থাৎ **সুবহানাল্লাহি আল্‌হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আর আল্লাহু আকবর** ... যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ্ বলেন, তার জন্যে ২০টি পুণ্য লেখা হয় আর ২০টি পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি **আল্লাহু আকবর** বলে তার জন্যেও এমন প্রতিদান রয়েছে এবং যে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলে তার জন্যেও এমনই প্রতিদান আর যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে **আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌র** সাথে **রব্বিল আলামীন**- ও বলে তার জন্যে ৩০টি পুণ্য লেখা হয় এবং ৩০টি পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বৈরুতে মুদ্রিত, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)।

♦ হযরত আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি কথা জিহ্বায় খুব হালকা, ও ওজনে খুবই ভারী, তাহলো **সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল 'আযীম** (বুখারী, কিতাবুত্ তৌহীদ)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং তাঁর প্রশংসাসহ বিদ্যমান। পবিত্র আল্লাহ্‌তাআলা বড়ই মহান।

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত

রসূল (সঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)

মুল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ

(১৪তম কিস্তি)

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) আনসারদের এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বনূ নাজ্জারের প্রদীপ ছিলেন। বংশ ও পরিবারের ধারায় নবুওয়ত পর্যন্ত পৌছে যায়। তাঁর মা উম্মি সলীম (রাঃ) বিন্‌তি মিলহান রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার দিক থেকে খালা ছিলেন। তিনি (রাঃ) হিজরতের প্রায় ১০ বছর পূর্বে ইয়াসরীবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিজের স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে সিরিয়ায় চলে যায় আর সেখানে মারা যায়। এদিকে হযরত উম্মি সলীম হযরত আবূ তালহার সাথে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে বিয়ে করে নেন। (এ আবূ ত্বালহাই উহুদের যুদ্ধের তীরন্দাজ)। হযরত আনাসের (রাঃ) নাম তাঁর চাচা আনাস বিন নযর (রাঃ)-এর নামানুযায়ী রাখা হয়েছিলো। ইতিহাসে ঐ আনাস বিন নযর (রাঃ) যিনি উহুদের মাঠে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হন। আশিটির ওপরে আঘাত পান। লাশকে বিকৃত করা হয়েছিলো। চিনাই যাচ্ছিলো না। বোন আঙ্গুলের চিহ্ন দেখে চিনতে পেরেছিলেন।

রসূল (সঃ)-এর সেবা ঃ

সারওয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন ইয়াসীব পৌছেন তখন বালক আনাস (রাঃ) রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বর্ধনা ও মারহাবা জানানোর সৌভাগ্য লাভকারী সৌভাগ্যবান বালকদের অগ্রভাগে ছিলেন। আর পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে সুখ ও আনন্দের ভুবনে 'আল্লাহ্‌র রসূল এসেছেন' ধ্বনি উচ্চকিত করতে ছিলেন। যেন সারা বিশ্ব কুন্ডলী পাঁকিয়ে তার ঘরে এসেছে। আর ঐ সময়েও তো হযরত আনাস (রাঃ) খুশীতে 'বাক বাকুম পায়রা' হয়েছিলেন যখন তাঁর মা উম্মি সলীম তাঁকে নবী (সঃ)-এর সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন আর নিবেদন করেছিলেন ঃ

হাযা আনাসুন গুলামুন ইয়াখদিমাকা

হুযূর ! এ বালক আনাস। আপনার সেবা করবে। আর এর পরে সকলে আনাসকে 'খাদেমে রসূল' এ উপাধিতে ডাকতেন। তিনি এতে গর্বিত হতেন আর হবেনবাই না কেন। নবীর চৌকাঠের ভিখারী হওয়ার চেয়ে আর গর্ব কী হতে পারে! তিনি রসূলের সেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তিনি ফজরের প্রাক্কালে হুযূর (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হতেন। হুযূর (সঃ)-এর ওযূর পানির ব্যবস্থা করতেন। দুপুর বেলা ঘরে যেতেন। পরে আবার নবী (সঃ)-এর সেবার জন্যে উপস্থিত হতেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঘরে আসা-যাওয়া অবাধে চলতো। রসূল (সঃ)-এর ঘরের সব কাজ শামলাতেন। একবার নবী করীম (সঃ) তাঁকে কোন জরুরী কাজের জন্যে পাঠালেন আর বল্লেন, কাউকে বলার দরকার নেই। মা জিজ্ঞেস করলে বল্লেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। সুব্‌হানাল্লাহ্! মা-ও কী রকম মহান ছিলেন! বলতে লাগলেন, ব্যস! আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে আর একথা কারও কাছে বলবে না।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর সেবাদাসের সম্পর্ক থেকে কেবল রসূল (সঃ)-কে এ মৃত্যুই আলাদা করতে পেরেছিলো। তিনি এ সম্পর্কের কারণে পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ লাভ করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তার (রাঃ) জন্যে দোয়া করেছিলেন।

"হে আল্লাহ্! তাকে (আনাস) ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততিতে কল্যাণ দিও আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিও"।

খোদার প্রিয় নবীর মুখ নিঃসৃত কথা তার ভাগ্য খুলে দিলো। আনাস (রাঃ)-এর বাগানে বছরে ২ বার ফল লাগতো। তিনি আনসারদের মধ্যে সবচে' বড় ধনী ছিলেন আর সন্তানের সংখ্যা তাঁর কল্যাণময় জীবনে শ' থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। তিনি বলতেন, "দু'টি বিষয় তো নিজ চোখে পুরো হতে দেখলাম তৃতীয় বিষয়টি অর্থাৎ জান্নাতের আশা পোষণ করছি"।

ধর্মীয় অন্যান্য সেবা ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর বিশেষ সেবক হিসেবে সব যুদ্ধে যোগ দেন এবং তাঁর (সঃ) মৃত্যুর পরে খলীফাগণের যুগেও পরিপূর্ণ আনুগত্য ও সেবার সম্পর্ক সমুন্নত রাখেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে (রাঃ) বাহ্‌রাইনে সদকা আদায়ের অফিসার নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর যুগে ধর্মীয় জ্ঞান শিখাবার জন্যে তাঁকে বসরায় চাকুরী দেন। এতদ্ব্যতিরেকে খলীফাদের যুগের সমস্ত যুদ্ধেও হযরত আনাস (রাঃ) অংশ নেন। 'অসতর' যুদ্ধে তিনি পদাতিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পরে তিনিই প্রধান সেনাপতি হরমুযানকে খলীফার দরবারে ইসলামী প্রধান সেনাপতি হযরত আবূ মূসা আশয়ারী-এর নির্দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বসরায় তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা হয়। ফিতনা - ফাসাদের যুগে তিনি তাঁর আঁচলকে কলুষিত হতে দেন নি। দুর্ভাগা হাজ্জাজ তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলো। লোকদের মধ্যে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে গলায় মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলো এবং আরও শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছিলো। হযরত আনাস (রাঃ) সাধারণভাবে খবর দেবার জন্যে খলীফা আব্দুল মালেককে চিঠি লিখেছিলেন। আব্দুল মালেক হাজ্জাজকে কঠোরভাবে সতর্ক করেন এবং হযরত আনাসের কাছে মাফ চাইতে আদেশ দেন। হাজ্জাজ মাফ চাইলে তিনি তার অনুরোধে খলীফার নামে একটি সন্তুষ্টির পত্র লিখে পাঠান।

রসূল প্রেম ঃ

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে হযরত আনাস (রাঃ)-এর গভীর প্রেম ও ভালবাসা ছিলো। তাঁর (রাঃ) নিকট রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি পবিত্র চুল ছিলো। মৃত্যুর সময়ে বল্লেন, আমার জিহ্বার নীচে রেখে দাও। এভাবে তিনি সমাহিত হলেন। রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একখানা ছড়িও তাঁর নিকট ছিলো। তাঁর ওসীয়্যত মোতাবেক তা-ও তাঁর পাশে সমাহিত করা হয়েছিলো। সুব্‌হানাল্লাহ্! প্রিয়তমের যে জিনিসই লাভ হয়েছিলো তাথেকেও মৃত্যুর সময়ে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করতে চান নি। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে বিচ্ছিন্নতা তিনি কীভাবে সহ্য করতেন? রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে তিনি অধিকাংশ সময় দেওয়ানা ও

আত্মভোলা হয়ে যেতেন যে, যদি হাস্‌সান-এর চোখের মণি না-ই থাকবে তো আনাস (রাঃ)-এর চোখের জ্যোতিও তো নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে থাকবে। এমন উচ্চ মার্গের ভালবাসার ফল ছিলো যে, প্রায়ই স্বপ্নে 'খাদেমে রসূল' নিজের প্রভুর (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতেন। প্রভুর কথা শুনাতেন তো কথায় চিত্র এঁকে দিতেন।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আকৃতি বর্ণনা করতেন তো প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরে আলোকপাত করতেন। তাঁর বর্ণনা কাণে অমৃত বর্ষণ করতো। একবার প্রিয়তমের বর্ণনা দিতে দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ

"কেয়ামতের দিনে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মুখীন হলে নিবেদন করবো, 'হুযূর (সঃ)-এর নগণ্য গোলাম উপস্থিত আছি' !

যখন সভায় রসূল (সঃ)-এর উল্লেখ করতেন তখন প্রভুর জন্যে বিচলিত হয়ে ঘরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) স্মৃতি বিজরিত পবিত্র জিনিসগুলো বের করতেন আর এভাবে মনকে সান্ত্বনা দিতেন। রসূল প্রেমের এ আবেগ তিনি (রাঃ) তার শিষ্যদের মধ্যেও ভরে দিয়েছিলেন। আর রসূলুল্লাহ্‌র ভালবাসার এ ফল ছিলো যে, তিনি রসূলের সুন্নত ও রীতি-নীতির অনুসরণের ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলতেন ঃ "আমি (আনাস) ইবনে সলীমের চেয়ে অন্য কাউকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মত নামায পড়তে দেখি নি।"

হযরত আনাস (রাঃ) রসূল করীম (সঃ)-এর প্রতি তার ১০ বছরের সেবার সংক্ষিপ্তসার এভাবে বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দশ বছরের দীর্ঘ সেবার সময় আমাকে কখনও বকা-ঝকা পর্যন্ত করেন নি। কখনও কোন ভুল বা আলসেমির জন্যে গালি-গালাজও করেন নি।"

পিতা-মাতার মত আদর ও স্নেহের খাতিরে হুযূর (সঃ) আনাস (রাঃ)-কে "বৎস" ও "আনীস" বলে ডাকতেন। কখনও ঠাট্টা করে "ইয়া যুলউযনায়েন' অর্থাৎ দু' কানওয়ালা বলে ডাকতেন।

'হামযাহ' -মটরের মত এক প্রকার সব্জী যা তিনি (রাঃ) তুলতেন। হুযূর (সঃ) এ কারণে আদর করে ও ভালবেসে তাঁকে (রাঃ) 'আবূ হামযাহ্' বলেও ডাকতেন। পরে তিনি এ উপাধিতেই পরিচিত হয়ে গেলেন।হযরত আনাস (রাঃ) বলতেন ঃ

'আঁ হযরত সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের নিকট ছাড়াও তাঁর (আনাস রাঃ-এর) মায়ের ঘরে যেতেন। কখনও কখনও সেখানে দুপুর বেলা বিশ্রামও করতেন। খাবার খেতেন।

হযরত উম্মি সলীম (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দিতেন। রসূল (সঃ)-এর স্ত্রী হযরত সাফীয়া (রাঃ) ও হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর বিয়ের ব্যবস্থা তিনি (রাঃ)-ই করিয়েছিলেন।

দোয়ার কবুলিয়ৎ ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) এমন একজন বুযূর্গ ছিলেন যার দোয়া কবুল হ'ত। হযরত জা'ফর থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার গরমের দিনে হযরত আনাস (রাঃ)-এর জমির কর্মচারী উপস্থিত হলো আর বললো, জমি শুকিয়ে গেছে। তিনি (আঃ) দাঁড়ালেন। ওযূ করলেন। বাইরে এসে দু' রাকাআত নফল নামায আদায় করলেন আর দোয়া করলেন। দেখতে দেখতে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসলো। খুব বর্ষা হলো। মাঠ-ঘাট সব বর্ষার পানিতে থৈ থৈ করতে থাকলো। যখন বর্ষা থামলো তখন হযরত আনাস (রাঃ) এক ব্যক্তিকে তার জমিতে কেমন বৃষ্টি হয়েছে তা দেখার জন্যে পাঠালেন। দেখা গেলো যে, তাঁর জমির পরে আর বৃষ্টি হয় নি (আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন তা ব্যতিরেকে)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেবা ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে সিরীন, হামীদুত্তাভীল, সাবিত বিনানী, কৃতাদাহ, হাসান বসরী, যহরী ও অন্যান্য অসংখ্য তাবেয়ীন অর্থাৎ সাহাবীদের পরের যুগের বযূর্গরা তাঁর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর সমস্ত বর্ণনা হাজার পর্যন্ত পৌছতে পারে। বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে ৮০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে ৭০টি আর সর্ববাদীসম্মত মতে রেওয়ায়াতের সংখ্যা ১২৮। তিনি (রাঃ) স্বয়ং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত আবী বিন কা'ব (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ যর (রাঃ), হযরত আবূ ত্বালহা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওহা (রাঃ), হযরত মা'আয (রাঃ) প্রমুখ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। তাঁর (রাঃ) শীষ্যদের মধ্যে হাসান বসরী, সা'ঈদ ইব্‌নি জাবীর, ইয়াহ্‌ইয়া বিন সা'ঈদ আনসারী প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সাহেবে উসুল এমন সব সাহাবা ছিলেন যা বর্ণনাকালীন অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হাদীস বর্ণনা করার সময়ে ভীতির অবস্থার শিকার হয়ে যেতেন এবং সাবধানতার উদ্দেশ্যে এ কথা বলতেন।

"ক্বলা আও কামা ক্বলা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (অর্থ-এভাবে বলেছেন অথবা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মত বলেছেন)।

হাদীসের জ্ঞান ছাড়াও ফিকাহ্‌র জ্ঞানেও তাঁর একটি বিশেষ স্থান ছিলো। ফিকাহ্‌বিদদের তিন স্তরে তাঁকে (আঃ) দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে গণ্য করা হতো।

অন্যান্য গুণাবলী ঃ

সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীকতা এবং কর্মের তাগিদ দিতে তিনি প্রকাশ্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সচরাচর তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পারদর্শী তীরন্দাজ ছিলেন। নিজের সন্তানদের সাথে তীর চালানোর প্রতিযোগিতা করতেন এবং অধিকাংশ সময়ে তাদেরকে হারিয়ে দিতেন। বসরাতে সর্বশেষ সাহাবী তিনিই ছিলেন। ইসলামের সীরাজে মুনীর (সঃ) থেকে সরাসরি কল্যাণ লাভকারী এ শেষ তারকা ১১০ বছর পর্যন্ত এক জগতকে আলোকিত করে ইসলামের গগনে সমাধিস্থ হলেন। এ উপলক্ষ্যে 'মুরিখ' বলেছিলেন ঃ

"আজ অর্ধেক পৃথিবী শেষ হলো"

বসরা থেকে ৬ মাইল দূরে 'যফ' নামক স্থানে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন আর সেখানেই সমাহিত হন। ক্বতন বিন মদরক ইনকিলাবী তাঁর (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান এবং রসূল (সঃ)-এর সেবক তাঁর প্রভু (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। সহীহ্ বুখারী, ২। জামি' তিরমিযী, ৩। আল্ আসাবা ফী তামিযিস্ সাহাবা, ৪। আসাদুল গাবা ফী মা'রিফুস্ সাহাবা ও ৫। আল্ আকমাল ফী আসমাইর রিজাল। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মাতা-পিতার সেবাতে জান্নাত

মানব শিশু দুনিয়াতে আগমন করেই স্বাবলম্বী হতে পারে না। যেমনটি পারে পশু-পাখি বা অন্যান্য জীব-জন্তু। তারা পৃথিবীতে পদার্পণ করেই প্রবৃত্তিজাত প্রেরণাতে ও প্রাকৃতিক নিয়মে যে যার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন ধারণোপযোগী কাজে প্রবৃত্ত হয়। অথচ সৃষ্টিকুলের শিরোমণি মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর হতে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মা-বাবা, বড় ভাই-বোন ও অপরাপর মুরব্বীদের স্নেহে লালিত-পালিত হয়। এদের নিকট হ'তেই পৃথিবীতে চলার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। স্বাভাবিক প্রয়োজনে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ সে পরিবেশ থেকে রপ্ত করে। এর ফলেই তার চলার পথ পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হ'তে থাকে।

কিন্তু মানুষও পশু-পাখির ন্যায় কেবল খেয়ে দেয়েই বেঁচে থাকার কর্তব্য শেষ করতে পারে না। যখন তার দৈহিক প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক অভাব অভিযোগ পূরণ করতে নিজে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠে তখনই সে অপরের জন্য চিন্তা করতে শুরু করে, চিন্তা করতে থাকে মা-বাবার জন্য, চিন্তা করতে থাকে পরিবারের বাড়ীর, মহল্লার গ্রামের সমাজের দেশের ও জাতির জন্য। এ চিন্তার সঙ্গে কর্মের সংযোগের জন্যই তার বুদ্ধিমত্তার ও জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে কেবলমাত্র একটি গুণের কারণে। সেটি হচ্ছে তার চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, এক কথায় তার মানবতাবোধ। এ মানবতাবোধের বিকাশে তার পরিবেশের সাথে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মা-বাবা সবাই মিলে তাকে পৃথিবীতে বাসোপযোগী জ্ঞান দান করার, সমাজে কল্যাণকামী নাগরিক হিসাবে বাস করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। নিয়মানুগ শিক্ষার ব্যবহারিক সর্বোত্তম প্রয়োগে আমাদের বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে শিক্ষক অন্যতম। কিন্তু মাতা-পিতার শিক্ষাই প্রথম ও প্রধান। আর মাতা-পিতাই প্রথম ও প্রধান শিক্ষক।

তাই হযরত রসূলে করীম (সঃ) আল্লাহর প্রতি কর্তব্যের পরেই মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলেছেন। এমনকি মাতার আসন পিতার আসনের উর্ধ্বে নির্ধারিত করেছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে।' এক ব্যক্তি রসূলে পাক (সঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আমার পক্ষ হতে সর্বাপেক্ষা বেশী সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাবার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা (বুখারী)। কেননা মাতাই গর্ভধারণের দুঃখ ও অসহায় অবস্থায় সন্তানের লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করেন। অসীম ধৈর্যের সাথে রোগ-শোক ভুলে গিয়ে সন্তানের প্রতি যত্নবান হন। শিশু যখন কেঁদে ওঠে তখন মা-ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, সন্তানের কী প্রয়োজন। নিজে কষ্ট সহ্য করে সন্তানের সুখ-সুবিধা বিধানের চেষ্টা করেন মা। বড় হয়ে সন্তান যখন বিদ্যা অর্জনের জন্য কিংবা সাংসারিক কাজে দূরদেশে যায়, তখন কোন বিপদ-আপদ হলে কেবল স্নেহের আকর্ষণেই মা সর্বাগ্রে অনুধাবন করতে পারেন সন্তানের অসুখ অসুবিধার কথা। মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নফল রোযা রাখেন, নফল নামায আদায় করেন, দান খয়রাত করেন, এতীম মিসকীনদের আহার করান, সদকা করেন, আর আল্লাহ্‌র কাছে রহমত কামনা করে সমস্ত দিন রাত দোয়া করেন।

একবার হযরত সুলায়মানের (আঃ) দরবারে দু'জন মহিলা এসে দু'জনেই একটি দুধের শিশুর মা বলে দাবী করে তাঁর ফয়সালা কামনা করেন। সবার সামনে দরবারে বসে খলীফা নির্দেশ দিলেন, শিশুটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'জনকে দিয়ে দাও। সবাই রায় শুনে হতবাক! কিন্তু যখন সত্যি সত্যি শিশুটিকে দু'ভাগ করার জন্য জল্লাদ খরগ হাতে এগিয়ে এলো, তখন মহিলাদ্বয়ের একজন শিশুটিকে কেটে অর্ধেক নিতে রাযী হলো, কিন্তু অপরজন চিৎকার করে বলে উঠলেন, হুযূর আমি সন্তান চাই না, সন্তান ওকেই দিয়ে দিন; তবুও তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখুন, কেটে ফেলবেন না। এ সময় কারোই বুঝতে বাকী রইল না যে, শিশুটির প্রকৃত মা কে? শিশুটিকে তাকেই প্রদান করা হলো। জাতকের প্রতি জননীর এই যে প্রাণের টান, এ চিরন্তন, এ বিশ্বজনীন। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ্‌পাক মায়ের গর্ভাশয়কে 'রহিম' বলে উল্লেখ করেছেন।

এ মহান জননীর প্রতি আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই? শৈশবে কেমন আদর যত্ন করে লালন-পালন করেছেন, কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন কেবলমাত্র আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। শরীরের রক্ত নিঃশেষ করে বুকের দুধ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রচণ্ড শীতের রাতে বিছানাতে প্রস্রাব করে মায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ ভিজিয়ে দিয়েছি, মায়ের কোলে পায়খানা করেছি, তাতে তিনি কখনোই বিরক্ত হন নি, রাগ করেন নি, করেন নি কোন বদদোয়া। আর পিতা? তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের খোরপোষ ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের কোন আবদারই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। এত যে স্নেহপরায়ণ পিতা-মাতা, যাদের নিঃস্বার্থ বাৎসল্যে এ ধরণীতে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। তাদের প্রতি কি আমাদের কোনই কর্তব্য নেই? তাদের সঙ্গে কি দুর্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে শোভা পায়? তাদের সঙ্গে কোন প্রকার বেয়াদবীতো অকৃতজ্ঞতার শামিল। তাদের সঙ্গে দুশমনী ও বেঈমানী হবে যদি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করি।

মহান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আলো, বাতাস, পানি ও খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরই উপর মানুষের সৃষ্টি ও পালন এবং সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণের ভার। তাই মানুষ বা সৃষ্ট বান্দা হিসাবে আমাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদতে ব্রতী হওয়া, তাঁর শরীয়তের পথে জীবন পরিচালনা করা। এর পর যাদের প্রতি কর্তব্যপালনে যত্নবান হওয়া উচিত তাঁরা হলেন মা-বাবা। মা-বাবার উপলক্ষ্যেই আমরা এই সুন্দর সুজলা, সুফলা সবুজ-শ্যামলে ঘেরা পৃথিবীটাকে দর্শনের তৌফীক লাভ করেছি। তাঁদের দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসাতে শৈশবে লালিত-পালিত হয়েছি। সর্বাবস্থাতে তাদের হিত কামনাতেই সংসারে চলতে শিখেছি। এ জগতে মাতা-পিতার ন্যায় আপনজন আর কেউ নেই। এহেন

হিতাকাঙ্ক্ষী মাতা-পিতার প্রতি সন্তান হিসাবে নিঃসন্দেহে আমাদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাঁরাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধেয়।

বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে আগত মহামনীষীগণের মতে, জগতে মানুষের জন্য তিনটি কর্তব্য অবধারিত রয়েছে- ১। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য, ২। মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, ৩। মানুষ বা সমাজের প্রতি কর্তব্য।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মাতা-পিতাকে বলা হয়েছে দেবতাস্বরূপ। প্রতি দিন সকাল ও সন্ধ্যায় স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরই মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতেই স্বর্গীয় দেবতার সন্তুষ্টি নির্ভরশীল। যেমন বলা হয়েছে- পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা! পিতার সন্তুষ্টিতেই সকল দেবতা তুষ্ট হন। পৃথিবীতে মাতা অত্যধিক মাননীয়া আর পিতার সম্মান স্বর্গেরও উর্ধ্বে। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হতেও গরীয়সী মহত্তর (মহাভারত)।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সূরা আহকাফে ১৬ আয়াতে এরশাদ করেছেন, **ওয়াওয়াস সাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি ইহসানা হামালাতহু উম্মুহু কুরহাঁও ওয়াওয়াযাআতহু কুরহান ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসালুহু সালাসুনা শাহরান, হাত্তা ইযা বালাগা আশুদ্দাহু-** অর্থাৎ- আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছি, কারণ তার মাতা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে (সূরাতুবনী ইসরাঈলঃ ২৪,২৫)।

আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে, **ওয়া কাযা রব্বুকা আল্লা তাবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়াবিল ওয়ালিদায়ীন ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদাহুমা আও কিলা হুমা ফালা তাকুল্ লাহুমা উফুফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়াকুললাহুম ক্বওলান কারীমান, ওয়াখফিয লাহুমা জানাহাযযুল্লি মিনার রহমাতি ওয়াকুর রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা** অর্থাৎ-তোমার প্রভু -প্রতিপালক নির্দেশ প্রদান করেছেন, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যখন তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশাতে বার্ধক্যে উপনীত হয়। তবে তুমি তাদেরকে 'উফফ' কথাটি পর্যন্ত বলবে না অথবা তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে সবিনয়ে কথা বলবে। ব্যবহারে তাদের প্রতি সহৃদয় হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে এই বলে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সদয় হও, যেমনটি তারা আমাদের শৈশবে আমাদের প্রতি সদয় হয়ে লালন-পালন করেছেন।

আমাদের গভীরভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মাতা-পিতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের উপরে ইহকাল ও পরকালের সফলতা নির্ভরশীল। অতএব তাদের প্রতি অশালীন ব্যবহার না করে ধর্মসম্মত আদেশ-নিষেধ মান্য করতে হবে। বিনয়ের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের খাওয়া-দাওয়া ও ভরণ-পোষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অসুখ-বিসুখে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় তাদের প্রতি মহব্বতের হস্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। যদি মৃত্যুর সময় বা পরে প্রমাণিত হয় যে, মাতা-পিতা ঋণগ্রস্ত তবে অবশ্যই সন্তান হিসাবে ঐ ঋণ পরিশোধের দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি আদরের মাতা-পিতার পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে দান-খয়রাত, নফল নামায আদায় ও দোয়াতে রত থাকতে হবে। জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সৈয়্যদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেছেন, **আল জান্নাতু তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম-** জান্নাত অর্থাৎ তোমাদের জননীর পদতলে। হুযূর (সঃ) দোয়ার কবুলিয়ত সম্বন্ধে নসীহত করতে যেয়ে বলেছেন, তিন ধরনের লোকের দোয়া খোদার আরশে পৌঁছে না; ১। মুশরিকের ২। মিথ্যাবাদীর ৩। মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের (বুখারী)।

আশেকে রসূল সাধক হযরত ওয়ায়েসকরণী (রহঃ) হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে এত বেশি মহব্বত করতেন যে, যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, ওহুদের যুদ্ধের সময় কাফিরদের প্রস্তারাঘাতে আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মদে মুস্তাফা (সঃ)-এর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছে, তখন তিনি এক একটি করে নিজের সমস্ত দাঁত ভেংগে ফেললেন। ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তিনি হুযূর (সঃ)-এর ওফাত প্রাপ্তির পর তোহফা হিসাবে হুযূর (সঃ) মোবারক জুব্বা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি হুযূর (সঃ)-এর সমসাময়িক কালে জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন নি। কারণ ছিল তাঁর বৃদ্ধা মাতা। তিনি তাঁর বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যেতে পারেন নি। পারেন নি আল্লাহ্র রসূলের এক কথা অমান্য করতে যে, জননীর পদতলে সন্তানের জান্নাত।

হযরত বায়যিদ বোস্তামীর নাম সবারই জানা আছে। এক রাতে তাঁর মা পানি পান করতে চাইলেন। ঘরে পানি না থাকাতে তিনি প্রবল শীতের রাতে বের হয়ে বহু কষ্টে পানি নিয়ে এসে দেখেন মা-জননী গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়েছেন। মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে, পানির পাত্রটি হাতে নিয়ে সমস্ত রাত মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোর বেলাতে মা যখন হযরত বায়েযিদ বোস্তামী (রহঃ)-কে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন তখন প্রাণ ভরে খোদার দরবারে সন্তানের জন্য দোয়া করলেন।

মহামান্য আলেকজান্ডার যখন ভারত বিজয়ে আসেন, তখন তাঁর মন্ত্রী তাঁর মায়ের নামে অভিযোগ করে পত্রে লিখেছিলেন, আপনার মায়ের কারণে রাজকার্য নির্বিবাদে পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। পত্রের উত্তরে আলেকজান্ডার তার মন্ত্রীকে লিখেছিলেন, দেখো, আমার মায়ের এক বিন্দু অশ্রুপাতে তোমার মতো শত শত মন্ত্রী ভেসে যেতে পারে। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করো। এমন শত সহস্র উদাহরণ দেয়া যায়। মোট কথা হলো, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের সবাই মায়ের সেবা ও যত্ন করে ধন্য হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের আদেশ পালনের জন্য চাকুরীর ও জীবনের তোয়াক্কা না করে বন্যা প্লাবিত দামোদর নদ সাঁতরিয়ে পার হয়েছিলেন। একদা এক সাহাবী (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি কামনা করলে, তিনি (সঃ) জানতে চাইলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। হুযূর পাক (সঃ) বললেন, তুমি মাতা-পিতার সেবাতে রত থাক এতেই জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব অর্জিত হবে (বুখারী, মুসলিম)।

প্রতিটি সন্তানের প্রথম কর্তব্য মাতা-পিতার বাধ্য হওয়া, তাদের শরীয়ত বিরোধী নয় এমন সফল আদেশ-নিষেধ পালন করা। সূরাতুল

আনকাবূত ৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করতে বলে, যাকে তুমি জাননা, তোমার প্রতি চাপ প্রয়োগ করে, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তোমাদের প্রত্যেককেই আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন আমরা তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করব। দ্বিতীয় কর্তব্য সত্যিকার মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টা করা, বিদ্বান, জ্ঞানীগুণী ও চরিত্রবান হওয়া এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণের চেষ্টা করা, আর তৃতীয় কর্তব্য মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রুষার কাজে নিয়োজিত থাকা, যেন কোনক্রমেই সন্তানের ব্যবহার তাদের অন্তুষ্টির কারণ না হয়।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, রাগিমা আনফু সুম্মা রাগিমা আনফু সুম্মা রাগিমা আন্‌ফু মান আদরাকা আবওয়াইহি ইনদাল কিবারি আহাদুহুমা আওকিলাহুমা ফালাম ইয়াদ খুলিলজান্নাতা (মুসলিম)। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলাতে মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলাতে মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলাতে মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবার দ্বারা) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। মনে রাখতে হবে, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দোয়া অব্যর্থ তীরের ন্যায়। মাতা-পিতার নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়া সন্তানকে জান্নাতবাসীতে পরিণত করে আর বদদোয়াতেই ইহকাল, পরকাল উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। সেই প্রকৃত ভাগ্যবান, যে মা-বাবার দোয়া পেয়ে ইহকাল ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করেছে। সহী বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, ১। অভ্যাসগত মদ্যপায়ী, ২। মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান ৩। এমন গৃহকর্তা যে তার গৃহে পতিতাবৃত্তির ন্যায় ফাহেশার স্থান দেয়। হুযূর (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হতে চায় সে যেন মা-বাবার প্রতি যত্ন ও আনুগত্যশীল হয় (বুখারী, মুসলিম)।

মাতা-পিতার ওফাতপ্রাপ্তির সাথে সাথেই সন্তানের করণীয় কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁদের ওফাতের পর রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দোয়াতে রত থাকতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, মাতা-পিতার জন্য দোয়া কর, তাঁদের মাগফিরাত কামনা কর। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওয়াদা রক্ষা করো, তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনকে সম্মান প্রদর্শন কর। মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে দান খয়রাত কর। মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই শাস্তি পায়। মাতা-পিতার রূহের মাগফিরাত কামনায় দান খয়রাত করলে নিজের মৃত্যু সহজ হয়। তাদের খেদমতের সুবাদে গুণাহের কাফ্‌ফারাহ্ হয়।

রসূলে পাক (সঃ) আরো বলেন, কোন সন্তান যদি মাতা-পিতার প্রতি একবার স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে আল্লাহ্ তার প্রতিটি দৃষ্টির জন্য একটি কবুলকৃত হজ্জের পুণ্য দান করবেন। হুযূর (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, দিনে একশতবার এরূপ করলে। হুযূর (সঃ) জবাব দিলেন, তা হলেও তিনি তা দিবেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যে ত্যাগ-তিতিক্ষা উহা পরিশোধের সাধ্য কারও নেই। যদি কোন সন্তান স্বীয় শরীরের চামড়া দ্বারা মাতা-পিতার পায়ের জুতাও তৈরী করে দেয় তবুও তাদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এমন অনেক সন্তান রয়েছে, যারা মাতা-পিতার বুকের রক্ত পানিতে পরিণত করে লেখা-পড়া শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি বেমালুম ভুলে যেয়ে বৃদ্ধ মাতা-পিতার বাল-সুলভ আচার-আচরণকে বরদাশ্‌ত না করে বৃদ্ধ আশ্রমে বা নিজেদের বাসস্থান হ'তে অন্যত্র সরিয়ে রেখে মাসিক খরচ চালিয়ে থাকেন। এর ফলে হয়তবা বৃদ্ধ মাতা-পিতার দৈহিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিন্তু এ বয়সে একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য শুধু মাত্র দৈহিক খাদ্যই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন মানসিক প্রশান্তি। আর সে প্রশান্তি শুধু মাত্র ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনীদের সাথে আমোদ-আহ্লাদ ও হাসি-খুশি সহঅবস্থানের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। কোথাও আবার দেখা যায় মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের জন্য একাধিক সন্তানেরা তাঁদেরকে বন্টন করে। বৃদ্ধ বয়সে একজন হ'তে অন্যজনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজন যৌবন কাল অপেক্ষা বৃদ্ধকালে কোন অংশেই কম নয়। তাই যদি কোন সন্তানের একার পক্ষে উভয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তবে সম্মিলিতভাবেই ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু তা হতে হবে উভয়কে একত্রে অবস্থানের মাধ্যমে। এতে যতটুকু কষ্ট হয় তা সন্তান হিসাবে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। নচেৎ মাতা-পিতার বিচ্ছিন্নতার বিরহ জ্বালাতে সমস্ত অর্জন জ্বলেপুড়ে ছাই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ কথা যা এ যামানার পরিত্রাণকর্তা, মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ'তে মাতা-পিতার প্রতি জগদ্বাসীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন উহা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রবন্ধের ইতি টানছি। তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সম্মান করেনা এবং সাধারণ বিষয়ে, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাঁদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের প্রতি আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। মাতা-পিতার আদেশ-নিষেধ অমান্য করা, তাঁদের সেবা-শুশ্রুষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা, তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় তখন কোন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে মাতা-পিতার অন্তরে কষ্ট দেয়ার পরিণতি হলো জামাতের গন্ডি হতে বেরিয়ে যাওয়া, যা কোন স্বচ্ছ বিবেকসম্পন্ন মানব সন্তানের কাম্য হতে পারে না। কেননা হুযূর পাক (সঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জামাত হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা যাবে তার মৃত্যু জাহিলিয়তের মৃত্যু হবে (মুসলিম)"

অতএব আসুন প্রত্যেকেই সাধ্যমত মাতা-পিতার খেদমতের মাধ্যমে স্বীয় ঈমান ও জান্নাত নিশ্চিত করি। আর তাদের জন্য দোয়া করি। **রব্বানাগ ফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল-মু'মিনীন ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী সগীরা।** হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে দিবসে হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিবসের জন্য মাফ কর আমাকে আর মাফ কর আমার মাতা-পিতাসহ সকল মু'মিনদের। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন রহম তারা করেছিল আমার প্রতি শৈশবকালে, আমীন।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম।

হযরত মূসা (আঃ)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

অতঃপর তাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মূসা (আঃ)-এর নিকট এরূপ মনে হ'তে লাগল যেন ঐগুলি দৌড়া-দৌড়ি করছে। তারা বলল, ফেরাউনের সম্মানের কসম! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হব।

তখন হযরত মূসা (আঃ) নিজ অন্তরে ভয় অনুভব করলেন। তখন আল্লাহ্‌তাআলা বললেন, 'হে মূসা ! তুমি ভয় করো না, কারণ তুমি প্রাধান্য লাভ করবে; এবং যা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিক্ষেপ কর'।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা যা পেশ করেছ, তা যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ একে ব্যর্থ করে দেবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না। অতঃপর তিনি হাতে রাখার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, ফলে তারা যে কলা-কৌশল করেছিল সবকিছুকেই উহা গ্রাস করে ফেলল। কারণ তারা যে কলা-কৌশল করেছে উহা কেবল যাদুকরের ধোঁকাবাজি। এবং যাদুকর যে দিক থেকে আসুক না কেন সফলতা লাভ করতে পারল না। এবং আল্লাহ্ নিজ কালামসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, যদিও অপরাধীগণ একে অপসন্দ করল।

তখন যাদুকররা প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করে সিজদায় পড়তে বাধ্য হ'ল। তারা বলল, আমরা হারূন ও মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনলাম যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন।

ফেরাউন বলল, তোমরা কি আমার হুকুমের পূর্বেই তার উপর ঈমান এনেছ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান যে, তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখিয়েছে। অতএব আমি নিশ্চয় তোমাদের অবাধ্যতার জন্য হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় খেজুর বৃক্ষের কান্ডে শূল বিদ্ধ করব। যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদিগকে জীবিত রাখবো। তখন তোমরা নিশ্চয় জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক শাস্তিদানকারী।

তখন ফেরাউন ও তার জাতির প্রধানগণের ভয়ে যে, তারা তাদের উপর নির্যাতন করবে, মূসার উপর কেবল তার জাতির কতিপয় যুবক ছাড়া অন্য কেউ ঈমান আনে নি।

এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে এক স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল আর নিশ্চয় সে সীমা লংঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তাহলে তাঁর উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা সত্যিকারভাবে তাঁর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণকারী হয়েই থাক। তার বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ কর না; এবং আমাদিগকে তুমি নিজ রহমতে কাফির জাতির অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার কর।

হযরত মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের নিজ জাতির জন্য মিশরে কতকগুলি ঘরের স্থান নির্ণয় করলেন এবং ঘরগুলি মুখোমুখি করে নির্মাণ করলেন এবং নামায কায়েম শুরু করলেন।

ফেরাউনের জাতি থেকে নেতৃবর্গ বলল, তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দিয়েছ যেন তারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং তোমাকেও তোমার উপাস্যদিগকে বর্জন করে?

ফেরাউন বলল, নিশ্চয় আমরা তাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করব এবং তাদের নারীদিগকে জীবিত রাখব, আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর প্রবল রয়েছি। তখন হযরত মূসা (আঃ) তার জাতিকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্ব-জগত আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন, এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য।

তারা বলল, আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বে ও আমাদিগকে নির্যাতন করা হ'ত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি বললেন, অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে শাসনকর্তা করে দিবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কীরূপ কাজ কর।

ফেরাউন তার জাতির মধ্যে ঘোষণা করল, হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নয় এবং এসব নদ-নদী কি আমার অধীন প্রবাহিত হচ্ছিল না? তথাপি তোমরা কি দেখছ না? না বরং আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না। হে প্রধানগণ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য কাদা মাটির উপর আগুন জ্বালাও এবং ইট প্রস্তুত কর আর আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করে যেন আমি ঐ সকল প্রবেশ পথে গিয়ে পৌঁছি এবং আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বূদকে দেখতে পাই; আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলে জানি।

তারা বলল, এতে কোন ক্ষতি নেই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব; নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন, যেহেতু আমরা হ'লাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ফেরাউন বলল, আমরা কি আমাদেরই মত দু'জন মানুষের উপর ঈমান আনব? অথচ তাদের জাতি আমাদের দাস?

শাস্তিঃ আল্লাহ্ ফেরাউনের জাতিকে বহু বছরের অনাবৃষ্টি এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করেছিলেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন তাদের উপর সুখ-শান্তি আসত, তারা বলত, এ আমাদের জন্য। কিন্তু যখন তাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করত তখন উহাকে তারা মূসা (আঃ)-এর তাঁর সঙ্গীদের দরুন অশুভ লক্ষণ মনে করত।

তখন আল্লাহ্ স্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে তাদের প্রতি ঝড়-তুফান এবং পঙ্গপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত পাঠিয়ে দিলেন, তবুও তারা অহংকার করল এবং তারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হ'ল। এবং যখন তাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হ'ত, তারা বলত, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রভু যে অঙ্গীকার করেছেন সেই অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে এই জঘন্য নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করে দাও তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু যখনই আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উপর থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করে দিতেন যদ্বারা তারা আক্রান্ত হত, কি আশ্চর্য! তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।

যখন হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন, হামান, ও কারূনের নিকট গিয়ে বললেন, তোমরা কেন আমাকে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলছো, আমিত নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রসূল হিসাবে এসেছি, তোমাদের প্রভু আমাকে তওরাত কিতাব দিয়েছেন। উহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করো না এবং এটা বনী ইসরাঈল জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ। এবং আমরা তোমাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নি যা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন থেকে বড় ছিল না।

তখন ফেরাউন বলল, ইহা পরিষ্কার যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয় যা মিথ্যারূপে বানানো হয়েছে এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এসব কথা কখনও শুনি নি। আর তুমি যদি সত্য হয়ে থাক, তাহলে তোমার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযিল করা হয় নি, অথবা কেন তোমার সাথে ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ হয়ে আসে নি? এভাবে ফেরাউন তার জাতিকে হালকা (বুদ্ধিহারা) করে ফেলল, ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে লইল।

নিশ্চয় কারূন ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতির অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কারূন (কোরা) অবিশ্বাস্য রকমের ধনী ছিল। সে ফেরাউনের অতি উচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদে পুষ্ট ছিল, সে ফেরাউনের স্বর্ণ-খনির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিল এবং খনি খুঁড়িয়ে স্বর্ণ বের করার একজন বিশেষজ্ঞ ছিল। মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে 'কারু' এলাকা স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এত ধন-সম্পদ দান করেছিলেন যে, উহার চাবিগুলি বহন করতে এক শক্তিশালী লোকের দলকেও ক্লান্ত করে দিত। সে একজন ইসরাঈলী ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে বিশ্বাস করত বলে বর্ণিত আছে। ফেরাউনের নিকট থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য কারূন স্বগোত্রীয় লোকদের উপর নির্যাতন করত এবং তাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করত।

তখন বনী ইসরাঈলীরা তাকে বলেছিল, গর্বিত হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদিগকে ভালবাসেন না; এবং আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাস গৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুল না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ কোর না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না। সে বলল, এ সব সম্পদ ও মর্যাদা তো আমি এমন জ্ঞান-বলে পেয়েছি যা শুধু আমার নিকটই আছে।

হযরত মূসা (আঃ)-কে ভয়ানক মিথ্যা দুর্নামের শিকার বানানো হয়েছিল ঃ ১। কারূন একজন মেয়েলোককে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য প্ররোচিত করল যে, মূসা (আঃ) তার সাথে অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত ছিল, ২। হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী মেরী এক মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল এই বলে যে, মূসা (আঃ) এক নারীকে অবৈধভাবে বিয়ে করেছে, এতে মেরী জঘন্য অপরাধ করেছিল, ৩। হারূনের প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মূসা (আঃ) তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, ৪। মূসা (আঃ) কুষ্ঠ রোগ ও সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন, ৫। সামিরী তাঁকে পৌত্তলিকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। এর ফলে ঐশী আযাব কারূনের উপর নিপতিত হয়েছিল এবং সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

একবার ফেরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, যেন আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালককে সাহায্যার্থে ডাকুক, নিশ্চয় আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাবে।

হযরত মূসা (আঃ) এবং তার উম্মত বললেন, তুমি আমাদের উপর শুধু এজন্য প্রতিশোধ নিচ্ছে যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসলো।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।

প্রকৃত বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি তার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে তার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে তাঁর নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হবে, এরূপ লোকদের জন্য হবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার পাদ-দেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে, উহাতে তারা সদা বাস করবে। বস্তুত যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার এই।

হিজরত ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ ওহী করলেন, তুমি আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাত্রিযোগে সফর কর, এখন সমুদ্রে ভাঁটার সময় পানি দ্রুত কমছে। তখন পারাপারের স্থানটি প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল; আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে তাড়াতাড়ি শুষ্ক সমুদ্র পাড়ি দেবার নির্দেশ দেন এবং বললেন, তুমি সমুদ্রে তাদের জন্য শুষ্ক রাস্তার নির্দেশ দাও, তুমি পশ্চাৎ থেকে ধরা পড়ারও ভয় করবে না এবং সম্মুখস্থ বিপদেরও আশংকা করবে না।

আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) তার অনুসারীদেরকে নিয়ে হিজরত করলেন। ফেরাউনের রাজধানী ছিল তালআবি সোলায়মান এবং সেখান থেকে বনী ইসরাঈলগণ প্রথমে উত্তর পূর্বদিকে তিম্‌সা উপসাগরের তীরে পৌছে, কিন্তু সেখানে দ্বীপ ও উপসাগরের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় দেখে তারা দক্ষিণে চলে আসে এবং সুয়েজ খালের নিকটবর্তী কোনও স্থানে লোহিত সাগরকে মাত্র ২/৩ মাইল প্রশস্ত পেয়ে অপর পারে 'কাদাসের' দিকে রওনা হয়ে যায়।

এদিকে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেত-কারীগণকে পাঠিয়ে দিল এই বলে যে, নিশ্চয় এরা একটি ক্ষুদ্রদল, তথাপি এরা আমাদিগকে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত করে তুলেছে। অতএব তারা সুর্যোদয় কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীগণ বলল, আমরা নিশ্চয় ধরা পড়ে গিয়েছি।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, কখনও নয়, নিশ্চয় আমার প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাদেরকে নিরাপদ পথ দেখাবেন।

তখন আল্লাহ্‌তআলার নির্দেশক্রমে হযরত মূসা (আঃ) লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন। ফলে উহা বিভক্ত হয়ে গেল, এবং প্রত্যেকটি খন্ড বড় বড় ঢিবির ন্যায় দেখাতে লাগল। ঐ পথে তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল। আর ফেরাউন ও তার সৈন্য দল অন্যায়ভাবে শত্রুতাবশতঃ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, কিন্তু ফেরাউনের দল যখন এসে সমুদ্র সৈকতে পৌছল, তখন জোয়ার এসেছিল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, বনী ইসরাঈলকে যথাশীঘ্র ধরে ফেলার জন্য বাসনাতিশয্যে তারা পানির মধ্যেই নেমে চলতে লাগল। ফেরাউনের সেনা বাহিনীতে বড় বড় রথ ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র থাকার কারণে মনে হয় পানির মধ্যে চলায় তাদের গতি মন্থর হয়ে পড়েছিল এবং সে কারণেই মধ্য সমুদ্রে পৌছতে না পৌছতেই ভরা জোয়ার এসে তাদিগকে ডুবিয়ে দিল। যখন ফেরাউন ডুবে যেতে লাগল, তখন সে বলল, আমি ঈমান আনলাম, সেই অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নেই, যাঁর উপর

বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

কিন্তু ফেরাউন ইতিঃপূর্বে অবাধ্যতা করেছিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন, তার দেহ দ্বারাই তাকে রক্ষা করবেন, যাতে সে তার পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হয়।

আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধীরে ধীরে পার হয়ে যাওয়ার পর ফেরাউনের মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে এবং কায়রোর যাদুঘরে উহা সুরক্ষিত রয়েছে। তার অবয়ব দৃষ্টে মনে হয়, ফেরাউন ক্ষীণ দেহী খর্বাকৃতির লোক ছিল এবং তার চেহারা ক্রোধ ও স্থূল বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। কারুন ও ফেরাউন এবং হামান এবং তাদের সৈন্য বাহিনীকে আল্লাহ্ ধৃত করেছিলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিলেন। এবং কিয়ামতের দিনেও তারা দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যারা অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ হযরত নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীকে উপমাস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্য থেকে দু'জন নেক বান্দার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উভয় স্ত্রী তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা উভয়ে স্বামী আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের কোন উপকারেই আসল না এবং বলা হ'ল, তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ কর।

এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমাস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর; এবং ফেরাউনও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর এবং আমাকে এই যালেম জাতি থেকে উদ্ধার কর।

ফেরাউনের স্ত্রী ঐ সকল মু'মিনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকস্বরূপ যারা পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একান্ত বাসনা করে ও আকুতি জানায়, এমন কি তিরস্কারকারী আত্মার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েও সময় সময় পদস্থলিত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জল নিদর্শন দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে এই নিদর্শনগুলি ছিল ঃ ১। লাঠির, ২। শ্বেত হস্তের, ৩। উকুনের, ৪। ব্যাঙের (যাতে অস্বাভাবিক মুষলধারে বৃষ্টির ইঙ্গিত নিহিত ছিল), ৫। পঙ্গ পালের, ৬। রক্তের অর্থাৎ এক প্রকার প্লেগ রোগের যার আক্রমণে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হতো, ৭। তুফানের যা ইসরাঈলীগণ নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার পর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পার হওয়ার সময়ে সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা ডুবিয়ে মেরে ছিল। ৮। মরার এবং ৯। ফল-ফলাদি ধ্বংসের নিদর্শন।

(চলবে)

- মোঃ হেলাল উদ্দীন আহমদ

কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তাকওয়ার মধ্যে সকল ইবাদতের পূর্ণতা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন" (সূরাতুল হাশ্র ঃ ১৯)।

সাধারণতঃ তাক্ওয়ার অর্থ খোদা-ভীরুতা, ভয় ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রেমাস্পদ ও আরাধ্যজনকে সঠিক করে মান্য করা। তাঁর মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির দিকে সাবধানতা অবলম্বন করা যেন তিনি কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হন। সংক্ষেপে এটাকেই তাক্ওয়া অবলম্বন বলে– যে কোন কর্ম কেবল এবং কেবলই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেন হয় তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। উপরোল্লিখিত আয়াতের বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নে দেখানো হচ্ছে, মহান আল্লাহ্র বাণী, "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও" (সূরাতু আলে ইমরান - ১০৩)। উক্ত আয়াতে **হাক্কাতুকাতিহি** বলে পরিষ্কার বুঝানো হচ্ছে যে, তাকওয়া শুধু বাহ্যিক বা মৌখিক নয়। এটি পবিত্র কুরআন নির্দেশিত আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবলম্বন সম্ভব। মোট কথায় দাস ও প্রভুর মধ্যে গভীর পরিপূর্ণ সম্পর্ককে সর্বাবস্থায় নজরে রাখার বিষয়-বস্তুর নামই তাকওয়া।

মহান আল্লাহ্তাআলার বাণীতে তাক্ওয়ার কথা এভাবেও বলা হচ্ছে, "যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত লাগিবার পরও- তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে' (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৭৩)। এ আয়াত এক বড় দলিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দেয়া এবং এ দুনিয়ার জীবনের মোকাবেলায় আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দেয়ার নামই হ'ল "মুত্তাকীর" জীবন। মহান আল্লাহ্তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম যে বাণী অবতীর্ণ করেন- তা ছিল তাক্ওয়ার পোশাক তা নিম্ন আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে ঃ "হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করে এবং সৌন্দর্যস্বরূপ, কিন্তু তাক্ওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। ইহা আল্লাহ্র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে" (সূরাতুল আ'রাফ ঃ ২৭)। উক্ত আয়াত এ দুনিয়াতে বেহেশ্তি জীবন গড়ার এক শক্তিশালী দলিল হিসাবে ইঙ্গিত করছে। এ আয়াতই জানাচ্ছে যে, যুগ-খলীফা (আইঃ)-এর ইচ্ছা ও নির্দেশ মোতাবেক এ দুনিয়াতে প্রতি পরিবার বেহেশ্ত নির্মাণ করতে সক্ষম, তার জন্য তাকওয়া-পূর্ণ জীবন ও পরিবার গড়তে হবে।

হযরত নবী করীম (সঃ)-এর বাণী পেশ করে কিছু আলোচনা করবো। হযরত সা'দ বিন আবিওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে ন্যায়পরায়ণ, অল্পেতুষ্ট, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী, বিনয়ী ও মিতব্যয়ী জীবন যাপন করে" (সহী মুসলিম, কিতাবুয্যোহদ ওয়ার রিকাক)। আঁ হযরত (সঃ)-এর হাদীসে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তা অতি সূক্ষ্ম বিষয়, আর সবগুলোই তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এ শব্দগুলো মানুষকে নির্জনে নিয়ে যেতে বাধ্য করে, নিজকে জগত সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে, যেমন আঁ হযরত (সঃ)-এর দাবীর পূর্বে তিনি সওর গুহায় আল্লাহ্র ধ্যান রত ছিলেন এবং এ যমানাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর পূর্বে যেমন জগত সংসার হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা সময় মসজিদে ইবাদত ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। সঠিক তাকওয়া অবলম্বন মানুষকে নিষ্পাপ নবজাত শিশুর ন্যায় করে তোলে। অপর এক মহান হাদীসে হযরত

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, "পৃথিবীতে তাকওয়াশীল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু হুযূর (সঃ)-এর হৃদয় জয় করতে পারে নি" (মুসনাদ আহমদ)। মহান আল্লাহ্‌তাআলা যে ব্যক্তিকে ভালবাসেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও সেই ব্যক্তিকেই ভালবাসতেন। অপর এক বাণী থেকে জানা যায় নবী আকরম (সঃ) যখন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে দেখতেন হুযূর (সঃ)-এর অন্তর আনন্দে ভরে যেত হুযূরের (সঃ) স্নেহমাখা দৃষ্টি তার উপর পড়ত। তার জন্য হুযূর (সঃ)-এর হৃদয় থেকে দোয়া উত্থিত হ'ত। তাকওয়া অবলম্বন সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে আবূ হুরায়রা তাকওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর, তুমি সবচে' ইবাদতকারী হয়ে যাবে। তুমি মিতব্যয়ী হও। তুমি সবচে' বড় কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। তুমি যা নিজের জন্য পসন্দ কর তা-ই অন্যের জন্যও পসন্দ কর, তুমি প্রকৃত মু'মিন হয়ে যাবে। তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদাচার কর তুমি খাঁটি ও প্রকৃত মুসলিম বলে গণ্য হবে। খিল্ খিল্ করে বেশি হাসবে না এতে অন্তর নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে (ইবনে মাজাহ্ কিতাবুয্ যোহদ)। উক্ত হাদীসের উপদেশগুলো ছোট হলেও এত গভীর যে, সত্য সত্যই মানব জীবনের জন্য শান্তির রাজ্য কায়েম করার ক্ষেত্রে অতি ভারী নসীহত এবং এগুলো তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত তো বটেই। এ দুনিয়াতে এত সুবিশাল তাওকয়ার বৃক্ষ লালন করে রেখে গেলেন যিনি (সঃ) মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে তাঁর (সঃ) তাকওয়া চাওয়ার ধরন বর্ণিত হয়েছে এভাবে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নারীসুলভ স্বভাব দিয়ে বিছানা হাতিয়ে দেখলাম হুযূর (সঃ) ঘরের মেঝেও সিজদারত, আল্লাহ্‌র দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়ারত ছিলেন, "হে আল্লাহ্ তুমি আমার হৃদয়ে তাকওয়া প্রদান করো" (মুসনাদ আহমদ)। কি প্রিয় চাওয়া আঁ হযরত (সঃ) এর! তাঁর (সঃ) তাকওয়ার কি অভাব ছিল? আর একটি হাদীস আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে যে, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব কে? এর উত্তরে আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "মকসুলুল কাল্‌ব ওয়া সুদুকুল্ লিসান"। সাহাবা (রাঃ) আবেদন করলেন, "সদুকুল লিসান" তো বুঝলাম যে সত্যবাদী কিন্তু "মকসুলুলক্বালব" বুঝলাম না। হুযূর (সঃ) বলেন, ঐ মুত্তাকী এবং ন্যায়পরায়ণ যার মধ্যে কোনপাপ থাকে না, অবাধ্যতা থাকে না, পরশ্রীকাতরতা থাকে না, কোন হিংসা থাকে না, এমন ব্যক্তি মাকসুলুলক্বালব" (ইব্‌নে মাজা, কিতাবুয্ যোহদ)। এ হাদীস তাকওয়ার মানদন্ডের উপরে মানুষকে অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করছে যে, তুমি যদি পাপ, অবাধ্যতা, হিংসা-প্রতিহিংসা থেকে মুক্ত থাকতে পার তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযত করেছেন। হযরত নবী করীম (সঃ)-এ ধরধাম হ'তে যখন বিদায় গ্রহণ করছিলেন, তখন তার (সঃ) হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সাহাবীদের নিকট পেশ করলেন এভাবে,-"একদিন ফজরের নামাযের পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। শুনা মাত্র সাহাবায়ে কেরামের চোখ থেকে পানি ঝরছিল, তাদের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। এমন অবস্থা দেখে একজন বলেছিলেন, "এতো বিদায় গ্রহণকারীর কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে।" আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ) আপনি আমাদিগকে কী উপদেশ দিচ্ছেন, হুযূর (সঃ) বল্লেন, "আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করতে বলছি" (তিরমিযী)। তাকওয়া বা খোদা-ভীতি দুনিয়ার কোন ভয়-ভীতির সাথে তুলনা করা যায় না।

এবার এ যুগের আল্লাহ্‌র প্রিয় মা'মুরের (আঃ) আলোচনার দিকে যাচ্ছি দেখি তিনি (আঃ) তাকওয়া সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি (আঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি স্পর্ধার সাথে পাপ, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তার অবস্থা খুবই ভয়ংকর। সে খোদাতাআলার আযাবের লক্ষস্থল হয়ে আছে। যদি বার বার করুণাময় আল্লাহ্‌র দান পেতে চাও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ঐ সমস্ত কাজ যা খোদাতাআলার অসন্তুষ্টির কারণ তা পরিত্যাগ কর। আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন সম্ভব হ'তে পারে না। মুত্তাকী হ'তে চেষ্টা কর। ঐ সকল লোক যখন ধ্বংস হতে থাকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে নি তখন ঐ সকল লোকদিগকে রক্ষা করা হবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। এরূপ অবস্থায় তাদের অবাধ্যতা তাদিগকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের তাকওয়া তাদিগকে রক্ষা করে থাকে" (মালফূযাত, ৫ম খন্ড) কি চমৎকার রক্ষার বাণী অভয় বাণী! যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা জামাত আল্লাহ্‌র ও তাঁর প্রেরিতদের দৃষ্টিতে মুত্তাকী না হয়ে যায় আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য তারা পায় না, তাদের জন্যে তাঁর সাহায্য আসে না। মুদ্দা কথা হলো তাকওয়াই সকল রক্ষার চাবি কবজ। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "তাকওয়া এমন এক বৃক্ষ যাহা হৃদয়ে রোপণ করতে হবে। সেই পানি দ্বারা তাকওয়া লালিত-পালিত হয়ে সমগ্র উদ্যানকে উর্বর করে দেয়। তাকওয়া এমন এক মূল, ইহা না থাকলে সবই বৃথা আর ইহা বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে।" তোমাদের উচিত, তোমরাও সহানুভূতি ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা রূহুল কুদুস হ'তে অংশ লাভ কর, কারণ রূহুল কদুস ব্যতীত প্রকৃত তাকওয়া লাভ হ'তে পারে না" (আল্ ওসীয়্যত, ১৭ ও ১৯ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত তাকওয়া লাভের স্থান তো আকাশে। এ জামানার শিক্ষক হযরত আকদস ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকওয়া সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা পুস্তকে বিস্তারিত বলেন, আমাদের সেগুলো পাঠ করে তার ওপরে আমল করা দরকার ঃ

প্রাণ প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাকওয়া সম্পর্কে যে নসীহত করেছেন, তা-ও স্মর্তব্য। হুযূর (আইঃ) বলেন, "আপনার পুণ্য কর্মগুলো আপনার হৃদয়ে লুপ্ত থাকা উচিত। আপনি আপনার পুণ্যকর্মগুলোকে পর্দা ফেলে ঢেকে রাখবেন। কখনও আপনার পুণ্যকর্ম যেন মানুষকে দেখাবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি না করে। যখন /আপনার এ রকম খেয়াল জন্মাবে তখন আপনি মনে করবেন যে, ইহা শয়তানী প্ররোচনা। ঐ সকল সহজ-সরল-মানুষ যারা এভাবে জীবন যাপন করে তারা প্রকৃত আহমদী। অতএব আপনারা যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে চান তারা হৃদয়কে তাকওয়া দিয়ে ভরে দিন। আপনি এমন চিন্তার বহু উর্ধ্বে চলে যান যে, আপনার তাওকয়া মানুষের চোখে কোন মর্যাদা পেল কিনা, নিশ্চয় আপনার তাকওয়া আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। নিশ্চয় আপনার তাকওয়া হযরত রসূল (সঃ)-এর দৃষ্টিতে থাকবে। ঐ যুগের মুত্তাকীদের উপর যে স্নেহ দৃষ্টি পতিত হয়েছিল আজও আমাদের উপর পতিত হবে, যদি আমরা প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে যাই। এই অর্থেও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একজন জীবন্ত রসূল!" হুযূর (আইঃ) আবার বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সকাল-বিকাল উঠতে-বসতে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর যেন দৃষ্টি দেয় যাতে তার ভিতরের অবস্থা কী তা সে দেখতে পারে। সে যদি দেখে যে, তার ভিতরে কেবল তাকওয়াই রয়েছে তবে নিশ্চয় সে সার্থক হয়েছে। নিশ্চয় তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র কৃপা-দৃষ্টি পতিত হবে। গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়াদিতে তাকওয়া অবলম্বন কর"(৩০ জানুয়ারী,৯৮-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা হতে)। মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু
মোয়াল্লেম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার একুশতম বছর ১৯০২-এর প্রধান প্রধান ঘটনা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য

মূল ঃ মোকার্‌রম রিয়াজ মাহমুদ বাজওয়া

১৯০২ সাল আহমদী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদের (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ২১তম সাল। এ সালের ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্‌র সাহায্যের ঈমানবর্ধক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন সম্পর্কীয় প্রচারের জন্য রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা শুরু হয়। হযরত আকদসের (আঃ) সুসংবাদলব্ধ বংশধরদের বিয়ে, উচ্চমানের বইয়ের প্রকাশনা, আল্লাহ্‌র এক দাবীকারকের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, উপমহাদেশে ও বহির্বিশ্বে ধারাবাহিক বয়াত ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের নিদর্শন সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বর্ণনা করা হলো ঃ

১। রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ (উর্দূ ও ইংরেজী) প্রকাশনা শুরু ঃ

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদের (আঃ) ১৯০১ সালের প্রস্তাব অনুসারে জানুয়ারী ১৯০২ সালে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব, এম এর সম্পাদনায় ইংরেজী ও উর্দূ দু'ভাষাতে রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম প্রথম কিছুদিন ইংরেজী পত্রিকাটি লাহোর থেকে প্রকাশ হয়। কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি কেবল লাহোর থেকে প্রকাশ হয়। পরে কাদিয়ানের আনোয়ারে আহমদীয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে।

পত্রিকায় হুযূরের (আঃ) লেখা ছাপা হতো। কোন কোন প্রবন্ধ সম্পর্কে হযরত সাহেব (আঃ) নোট লিখিয়ে দিক-নির্দেশনা দিতেন। এ পত্রিকা দেশের ভেতরে ও পাশ্চাত্যে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করে। প্রথম বছর দেশের ভেতরে এর প্রভাবে অনেক পত্রিকাও ব্যক্তি সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

অনেক খবরের কাগজে এ পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে "আল্ বায়ান, লক্ষ্ণৌ, মিল্লাত, লাহোর, পত্রিকা ক্রিসেন্ট, লিভারপুল, রিভিউ অফ লাহোর, রিভিউ লন্ডন, অন্যতম। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব তাদের ওপর এ পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলেকজান্ডার রসলওয়াব (আমেরিকা), শেখ আবদুল্লাহ্ কাইউম (লিভারপুল), কাউন্ট টলসটয় (রাশিয়া) ও ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামের এডিটর প্রফেসর হাটস্‌মা উল্লেখযোগ্য।

২। জামাতী চাঁদার জন্য ব্যবস্থাপনা ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সব সময় এ চিন্তা করতেন যেন সত্য সন্ধানীর একটি দল তাঁর কাছে সর্বদা থাকে। নিকট ও দূর থেকে লোক এসে যেন তাঁর সান্নিধ্য পায়। তাঁর কাছ থেকে খোদার নৈকট্য লাভের পথ শেখে। এছাড়া যা কিছু তাঁর বইতে কিম্বা ইশ্‌তিহারে লেখা হয়েছে তা যেন ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়। যদিও এ কার্যক্রম তখনও ধারাবাহিকভাবে চলছিল। এজন্য জামাতের একনিষ্ঠ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় সাধ্য অনুসারে খরচের বোঝা উঠাতেন। কিন্তু তখন কেবলমাত্র লঙ্গরখানার খরচই মাসে আটশ' টাকা পর্যন্ত উঠতো। এছাড়া মাদ্রাসা তালীমুল ইসলাম ও পত্রিকার (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্) প্রকাশনার জন্য জামাতের ওপর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এজন্য জামাতের চাঁদা জমা করার ব্যবস্থাপনা কায়েম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০২ সালের ৫ মার্চ এক ইশ্‌তিহারের মাধ্যমে এ উপদেশ দেন যে, প্রত্যেক আহমদী লঙ্গরখানা ও মাদ্রাসা আহমদীয়াতের প্রয়োজনের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুসারে মাসিক চাঁদা ধার্য করে যেন মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে জানান। লাযেমী চাঁদা ছাড়া যাকাত ও সদকার টাকা সম্পর্কে তিনি জানান যে, প্রতি মাসে তা এখানে পাঠাতে হবে। এই ইশ্‌তিহারে (যেটি জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে মর্যাদা রাখে)। হুযুর (আঃ) এ নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে তাগিদ দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যারা শীষ্য তাদের উচিত নিজেদের ওপর মাসিক কিছু চাঁদা নির্ধারণ করা। এক পয়সা বা আধূলী যাই হোক। যে ব্যক্তি কোন কিছুই ধার্য করে না কিম্বা জামাতের জন্য কোন কায়িক পরিশ্রম করে না, সে মুনাফিক। এখন এরপর সে এ সিলসিলাতে থাকতে পারবে না। এ ইশ্‌তিহার প্রকাশ হওয়ার তিন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক বয়াতকারীর জন্য অপেক্ষা করা হবে যে, তারা এ সিলসিলার জন্য মাসিক কিছু চাঁদা দিতে সম্মত কিনা। তিন মাস পর্যন্ত কারো উত্তর না এলে বয়াতের সিলসিলা থেকে তার নাম কেটে দেয়া হবে এবং বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। এ ইশ্‌তিহারের ফলে লঙ্গারখানা ও পত্রিকার জন্য নিয়মিতভাবে চাঁদা আসা শুরু হয়। অনেক বন্ধু খুব উৎসাহ দেখান। বিশেষতঃ পাঞ্জাব প্রদেশের আহমদী জামাতগুলি এরূপ সুন্দরভাবে এতে অংশ নেয় যে, হুযূর (আঃ) তাদের খুব প্রশংসা করেন।

৩। সাপ্তাহিক খবরের কাগজ আল্ বদরের গোড়া পত্তন ঃ পূর্ব আফ্রিকার মোকার্‌রম বাবু মুহাম্মদ আফজল সাহেব ও ডাঃ ফয়েজ আলী সাবের সাহেবের চেষ্টায় ১৯০২ সালের ১৩ অক্টোবর এ পত্রিকা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হয়। নমুনা হিসাবে প্রথম সংখ্যা "আল্ কাদিয়ান" নামে ছাপা হয়। পরে হুযূর (আঃ) এর নাম আল্ বদর রাখেন। আল বদরের মালিক ও প্রকাশক ছিলেন মোকার্‌রম বাবু মুহাম্মদ আফজল সাহেব এবং ম্যানেজার ছিলেন মোকাররম মুন্সী ফয়েজ আলি সাবের সাহেব। মোকার্‌রম বাবু মুহাম্মদ আফজল সাহেবের মৃত্যু হয় ১৯০৫ সালের ২১শে মার্চ। তখন পত্রিকা মোকার্‌রম মির্যা মীরাজুদ্দিন ওমর সাহেব কিনে নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মুফতী মহম্মদ সাদেক সাহেবকে এর সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করেন। তাঁর সম্পাদনায় এ পত্রিকার নাম বদর রাখা হয়। বদর ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে কাদিয়ানের দরবেশদের চেষ্টায় পত্রিকাটি দ্বিতীয়বার চালু হয়। এ সময়ে এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন, মৌলভী বরকত আহমদ রাযেকী সাহেব। এরপর মৌলভী হাফেয বাকাপুরী সাহেব এর দায়িত্বে ছিলেন। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "আল্ হাকাম ও আল্ বদরকে নিজের দু'বাহু হিসাবে অঙ্গীকার করেন।

৪। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের বিয়ে। ১৯০২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সম্পন্ন হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২২শে মার্চ, ১৯০২ তারিখে চিঠির মাধ্যমে তাঁর শীষ্য মৌলভী গোলাম হোসেন সাহেব পেশওয়ারীর নিকট প্রস্তাব পাঠান। তিনি তাঁর মেয়ে সরওয়ার সুলতানা সাহেবার জন্য এ সম্বন্ধ খুব পবিত্র অন্তরে গ্রহণ করেন। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ বিয়ের এলান করেন।

৫। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের বিয়ে।

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদের (রাঃ) বিয়ে রুড়কীতে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) -এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে হযরত ডাঃ খলীফা রশীদউদ্দিন সাহেবের মেয়ের সাথে ঠিক হয়। যার নাম সৈয়্যদা মাহমুদা বেগম সাহেবা। হযরত সাহেবযাদা সাহেবের প্রথম বিয়ের এলানও করেন হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব। এক হাজার টাকা দেন মোহরে এ বিয়ে হয়। রুখসতি (বধু বিদায়) হয় ১৯০৩ সালের অক্টোবরে।

৬। মোবাহাসা মুদ্দ ঃ অমৃতসরের মুদ্দ গ্রামের এক বুযূর্গ মিয়া মহম্মদ ইয়াকুব আলি আহমদী হওয়াতে বিরোধীরা গোলমাল শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে বিতর্কিত বিষয়-বস্তুর ওপর বাহাসের ব্যবস্থা করে প্রতিদ্বন্দী দল। বাহাসের প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল ওফাতে ঈসা (আঃ) হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদের (আঃ) আদেশে মাওলানা সরওয়ার শাহ্ সাহেব মুদ্দ যান। তাঁর সাথে মৌলভী আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরী সাহেবও ছিলেন। বিরোধী পক্ষে ছিলেন মৌলভী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী সাহেব। জনাব আহমদ আলি সাহেবের এক বন্ধু বাহাসে সভাপতিত্ব করেন। এ বাহাসে খোদাতাআলা মাওলানা সরওয়ার শাহকে সুস্পষ্টভাবে সফলতা দান করেন। বাহাস হয় ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে।

৭। বাটালা সফর ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাদিয়ানের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বাটালায় যান।

৮। ডুইকে মোবাহালার আমন্ত্রণ ঃ

১৮৭২ সালে স্কটল্যান্ডের ডঃ আলেকজান্ডার ডুই একজন সফল বক্তা ও পাদরী হিসাবে জনগণের সামনে আসেন। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোয় একটি বাড়ী ক'রে তাঁর চালাকী শুরু করেন। এ ব্যক্তি ঘোষণা করেন, বিশ বছরের মধ্যে তিনি সারা দুনিয়া জয় করে নেবেন। তিনি ইসলামের ভয়ংকর শত্রু ছিলেন এবং নিজেকে ঈসা মসীহের একজন নবী হিসাবে দাবী করেন। ডুইয়ের দাবীর বিবরণ শুনে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা দেখে হযরত মসীহ্ (আঃ) এ ব্যক্তিকে সত্য ও অসত্যের মধ্যে মীমাংসার জন্য সহজ পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানান ও মোবাহালার দাওয়াত দেন। হুযূর (আঃ) ১৯০২ সালে এ মোবাহালা বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেন। মোবাহেলার এ দাওয়াত আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। শেষে এ ব্যক্তি নিজের কটু কথার জন্য প্রথমে চারিত্রিকভাবে মৃত্যু প্রাপ্ত হন এবং পরে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোসের সাথে মারা যান।

৯। পীগটের সম্পর্কে হযরত আকদসের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

আমেরিকাতে ডুইয়ের পরে লন্ডনে খবর প্রকাশ হয় যে, ওখানে ক্লীপটনের এক পাদ্রী জারী হউক স্মীথ পীগট ১৯০২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর গীর্জাতে ওয়াজ করার সময় নিজে খোদা হওয়ার দাবী করেন। এ ব্যক্তিও ইসলামের প্রবল বিরোধী ছিলেন। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (সঃ) এ ব্যক্তির নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যার বিষয়-বস্তু ছিল "এক ঈশ্বরত্বের দাবীদারের প্রতি উপদেশ" ইংল্যান্ডের পত্রিকাগুলিতে এ ইশ্তিহার ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালের ২২ আগষ্ট হুযূর (আঃ) আরও একটি ইশ্তিহার প্রকাশ করেন যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। "হে সাহসী মিথ্যাবাদী অর্থাৎ পীগট যিনি লন্ডনে খোদা হওয়ার দাবী করেছেন। তিনি আমার চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবেন।" এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পীগট অকৃতকার্যতা ও বিফলতার শিকার হয়।

১৯০২ সালের প্রকাশনা ঃ

১। দাফেউল বালা ও মায়ারে আহলিল ইস্তিফায়া ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দেশবাসীকে প্লেগ থেকে বাঁচানোর জন্য ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে এ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে হুযূর (আঃ) তার ইলহামের আলোকে প্লেগের আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট, গৃহের বিশেষত্ব ও কাদিয়ানের প্লেগ থেকে সাধারণ মানুষের হেফাযত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি ভারতের সকল ধর্মীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ দেন যে, তারা যেন প্লেগের জন্য যে কোন নিরাপদ স্থানের নাম উল্লেখ করে তাদের ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ দেন।

২। আলাহূদা ওয়াত্তাবসীরাতুল্লিমাঁইয়্যারা ঃ

এ পুস্তিকা ১৯০২ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রকাশিত। লেখার প্রেক্ষাপট হ'ল হুযূর আকদস (আঃ) মিশরের কিছু আলেম ও সুফীদের কাছে "এজাযে মসীহ্" পুস্তিকা পাঠান। একটি পুস্তিকা "আল্ মিনার" পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ রশীদ রেযাকেও পাঠানো হয়। কায়রোর পত্রিকা "মনাযের" ও "হেলাল" পত্রিকা এজাযে মসীহ্ পুস্তকের উচ্চাঙ্গের ভাষা ও মনোজ্ঞ রচনার ভূয়সী প্রশংসা করে। কিন্তু সৈয়্যদ মুহাম্মদ রশীদ রেযা সাহেব এই পুস্তক ও হুযূর (আঃ)-এর কঠোর সমালোচনা করে। এ সমালোচনার সাহায্য নিয়ে বিরোধী আলেমরা নিজেদের পক্ষ থেকে অতিরঞ্জিত করতে থাকে। যার উত্তর হুযূর আকদস (আঃ) উচ্চাঙ্গের ও বাগ্মিতা পূর্ণ ভাষায় **আলহূদা ওয়াত্তাবসীরাতুললিমাঁই'য়্যারা** রচনা করেন।

৩। নযূলে মসীহ্ ঃ ১৯০২ সালের জুলাই / আগষ্ট মাসে এ পুস্তক প্রকাশনার কাজ শুরু হয়। যতটা লেখা হ'ত তা সাথে সাথে ছাপা হ'ত। মৌলভী করম দীন সাহেবের কিছু চিঠিও হুযূর (আঃ) এ পুস্তকে প্রকাশ করেন। মৌলভী সাহেব কোন উপায়ে ছাপা অংশ পেয়ে যান এবং আদালতে মামলা দায়ের করেন যে, চিঠি-পত্র জাল। এগুলো তার নয়। ফলে এ পুস্তক সম্পূর্ণ ছাপা হয় নি। হুযূর আকদসের (আঃ) মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

৪। কিশ্তিয়ে নূহ ঃ এ বই ১৯০২ সালের ৫ অক্টোবর ছাপা হয়। এতে হুযূর আকদস (আঃ) সরকারের পক্ষ থেকে প্লেগের টিকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশংসা করেন। এ বইতে তিনি নিজের পবিত্র শিক্ষারও বিবরণ দেন।

৫। তোহফাতুন্ নদওয়া ঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় আন্দোলনের সমান্তরাল মধ্যবর্তী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ১৮৯৪ সাল থেকে "নদওয়াতুল ওলামা" নামে এক সংস্থা লক্ষ্ণৌতে কাজ করতো। এর কাজ ছিল শিক্ষার পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং বিশেষভাবে মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপন। মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলী সাহেব কানপুরী এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রখ্যাত আলেম মাওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) এবং তফসীরে হাক্কানীর রচয়িতা আব্দুল হক সাহেব এর নিয়মাবলী ও আইন-কানুনের সংশোধন করেন। মুসলমানদের বড় বড় নেতা যেমন স্যার সৈয়্যদ নওয়াব মুহসীন-উল-মূলক, নওয়াব ভিকারুল-মূলক একে স্বাগত জানায়।

১৮৯৪ সালের এপ্রিলে কানপুরে এর প্রথম সভা হয়। এরপর লক্ষ্ণৌ, বেরেলবী এবং মীরাটে এর সভা হয়। ১৯০১ সালে নদওয়াতুল ওলামার সভা কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-কে যোগদানের আমন্ত্রণ

জানানো হয়। হুযূর (আঃ) নিজের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যস্ততার কারণে সভায় যোগদান করতে পারেন নি। কিন্তু হুযূরের (আঃ) পক্ষ থেকে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব নদওয়ার নামে এক বিশ্লেষিত তবলীগী চিঠি লেখেন। যাতে যুগ-ইমামের আওয়াজে লাব্বায়েক বলার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু নদওয়া কর্তৃপক্ষ এর কোন উত্তর দেন নি। পরের বছর ১৯০২ সালের ৯,১০ ও ১১ অক্টোবর এ সংগঠনের সভা অমৃতসরে হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। হাফেয মহম্মদ ইউসুফ সাহেব পানসিজ, যিনি লাও তাক্বওয়ালা আয়াত সম্পর্কে হুযূর (আঃ)-এর মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি সভার এক সপ্তাহ আগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নামে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করেন। তাতে বলেন, তার কাছে এ প্রমাণ আছে যে, প্রতারক ও মিথ্যা ইলহামের দাবীদারও আঁ হযরত (সঃ)-এর মত ইলহাম প্রাপ্তির দাবীর পরেও তেইশ বছর বয়স পেতে পারে। তাঁর বন্ধু ইসহাক মুহাম্মদ দীন **কুতউল ওয়াতীন** নামে এক পুস্তিকা লেখেন। যাতে এরূপ মিথ্যুক দাবীকারকদের নাম ও দাবীর মেয়াদ ইতিহাসের বই থেকে উদাহরণ হিসাবে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, "মির্যা সাহেব জলসাতে যোগদান করুন এবং লিখে দেন যে, যদি নদওয়ার নির্ধারিত আলেমরা ইতিহাসের নিরিখে একে সত্য বলে মেনে নেয় তবে মির্যা সাহেব জলসায় তওবার এলান করবেন।" যেহেতু এ বিজ্ঞাপন থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সত্যতার ওপরও অপবাদ আসে এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর অমর্যাদা হয় এজন্য হযরত আকদস (আঃ) ৬ অক্টোবর, ১৯০২ তারিখে "তোহফায়ে নদওয়া" নামে এক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে তিনি সুন্দর ও মুক্তভাবে হাফেয মহম্মদ ইউসুফ সাহেবের ভুল মতকে নাকচ করেন এবং খোদার কাজের সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন।

১৯০২ সালে বয়াত ঃ কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত "আল্ হাকাম" পত্রিকার তালিকা অনুসারে ১৯০২ সালে মোট এক হাজার পাঁচশ' আঠারো (১৫১৮) ব্যক্তি বয়াত গ্রহণের তৌফীক লাভ করেন। উপমহাদেশ ও বাইরের দেশের ২২টি স্থানে এ বয়াত হয়।

[তারিখে আহমদীয়ত, তবলীগে রেসালত, মাসিক আনসারুল্লাহ্ (উর্দূ) জানুয়ারী, ২০০১ থেকে]

ভাষান্তর - **কওসার আলী মোল্লা**

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান

"...এ জামাত হবে এমন একটি বাতিঘর যা পৃথিবীর চার দিক আলোকিত করবে। এ জামাতের সদস্যগণ হবেন ইসলামী রহমতের নিদর্শনস্বরূপ ..."-(হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২০০২ সালের ২৩শে মার্চ, তার প্রতিষ্ঠার ১১৩ বৎসর পালন করতে যাচ্ছে। একশ' তের বৎসর আগের এই দিনে প্রথম বয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এই ঐশী নির্দেশ লাভ করেন যে, তিনি যুগের সংস্কারক এবং মা'মুর। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু ১৮৮৯ সালের আগ পর্যন্ত তিনি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন নি। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে সুস্পষ্ট ঐশী-নির্দেশনা দেয়া হয় বয়াত গ্রহণের ...

" ... অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।" ...

"নিশ্চয় যারা তোমার বয়াত করে বস্তুতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর আছে ...

এসব সুস্পষ্ট ঐশী-নির্দেশনা লাভের পর তিনি ১৮৮৯ সালে লোকদিগকে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, তিনি 'তকমীলে তবলীগ' নামক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

প্রথম বয়াত

যারা তাঁর হাতে বয়াত করতে ইচ্ছুক এ প্রচারপত্রে তিনি তাদের জন্য দশটি শর্ত নির্ধারণ করেন। এই শর্তাবলী হচ্ছে সেই শর্তাবলী যা মেনে আজও লোক বয়াত করে। শর্তগুলো হচ্ছে-

(১) বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে যে, এখন হতে ভবিষ্যতে মরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতাআলার অংশীবাদিতা) হতে পবিত্র থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর শিকারে পরিণত হবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে ও ইস্তিগফার পড়বে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করবে।

(৪) উত্তেজনার বসে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট করণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর মীমাংসা মেনে নেবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) আল্লাহ্‌তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার

আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ ঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)।

এই প্রচারপত্রটি প্রকাশ করার পর হযরত আহমদ ১৮৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ লুধিয়ানা থেকে আরেকটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তিনি এর কিছুদিন আগে নিজ শহর কাদিয়ান হ'তে লুধিয়ানায় আসেন এবং তিনি লুধিয়ানায় সুফী আহমদ জান সাহেবের বাসায় উঠেন।

এই দ্বিতীয় প্রচারপত্রে তিনি বিধৃত করেন যে, বয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসীদের একটি জামাত স্থাপন। যারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা, ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রকাশ ও প্রচার করবে। এ জামাত হবে সেসব পুণ্যাত্মা লোকদের জামাত যারা তাদের পবিত্র কার্যাবলীর মাধ্যমে লোকদিগকে ধর্মের পথে নিয়ে আসবে এবং মর-জগতের জন্য এক রহমতপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

হযরত আহমদ এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যে, আল্লাহ্ এ জামাতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করবেন। এবং হাজারো লোক এ জামাতের পতাকাতলে আসবে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, এ জামাত প্রভূত উন্নতি লাভ করবে। উচ্চ পর্বত শিখরে স্থাপিত আলোকস্তম্ভের মত হবে। এ জামাত যার আলো নিকটে ও দূরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

প্রচারপত্রে শেষে তিনি বয়াত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের ২০শে মার্চের মধ্যে লুধিয়ানায় আসার আহবান জানান।

প্রচারপত্র প্রকাশের পর তাঁর অনুগতরা লুধিয়ানায় আসা শুরু করেন। তারা এসেছিলেন জম্মু, খোস্ত (Khost), ভেরা (Bhera), শিয়ালকোট, গুরুদাসপুর, গুজরাঁওয়ালা, পাতিয়ালা, জলন্ধর, মালির কোটলা, আম্বালা, মীরাঠ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য লোকালয় হ'তে।

মূল বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল হযরত আহমদ (আঃ) যেখানে উঠেছিলেন সেখানে অর্থাৎ সুফী আহমদ জান সাহেবের বাসায়।

হযরত আহমদ (আঃ) উপবেশন করেছিলেন একটি বড় ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যা বর্তমানে 'দারুল বয়াত' নামে পরিচিত। শেখ হামিদ আলী নামক তাঁর একজন খাদেম দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বয়াত গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখপূর্বক একজনের পর আরেকজনকে গৃহে প্রবেশের জন্য আহ্বান জানান। প্রথম যে ব্যক্তিকে বয়াত গ্রহণের জন্য ডাকা হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (পরবর্তীতে তিনি জামাতের প্রথম খলীফা হয়েছিলেন)। তারপর একে একে বয়াত গ্রহণ করেন মীর আব্বাস আলী, শেখ মোহাম্মদ হোসেইন, মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সনৌরী, টঙ্কীর মৌলভী আবদুল্লাহ্ সাহেব এবং এরপর (খুব সম্ভবতঃ) মুন্সী আল্লাহ্ বক্স। এই প্রথম ছ'জনকে বয়াত গ্রহণের জন্য হযরত আহমদ সাহেব নিজেই ডেকেছিলেন।

এরপর শেখ হামিদ আলীকে অপেক্ষমান অন্যান্য লোকদের একের পর এক ভেতরে পাঠাতে বলা হয়।

প্রথম দিন চল্লিশজন লোক বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী সুঘরা বেগম (Sughra Begum)।

মূল অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সাধারণ-অনাড়ম্বরপূর্ণ। হযরত আহমদ মাদুর বিড়ানো মেঝেতে বসেছিলেন। তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে বয়াত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির ডান হাত স্পর্শ করেন। এরপর তিনি বয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে তাঁর সাথে সাথে নিম্নলিখিত পবিত্র শাব্দাবলী উচ্চারণের আহ্বান জানান

"আমি হযরত আহমদের হাত ধরে অনুতাপ করছি, আমার সকল পাপ ও বদ অভ্যাসের জন্য, আমি যেগুলোর বশবর্তী ছিলাম আমি অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি সকল প্রকার পাপ হতে দূরে থাকার জন্য সচেষ্ট থাকব। আমি পৃথিবীর সকল কিছুর উপর ধর্মকে প্রাধান্য দেব। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত প্রচারপত্রে উল্লেখিত বয়াতের দশটি শর্ত মেনে চলার। আমি আমার অতীত পাপসমূহের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" উপরোক্ত বাক্যগুলো উর্দূতে বলা হয়েছিল। এরপর আরবীতে পাঠ করা হয়-

"আমি আমার প্রভু আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হ'তে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও রসূল।

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছি এবং আমি আমার সকল গুনাহ্ স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা কর, কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ ক্ষমাকারী নাই।"

এরপর হযরত আহমদ (আঃ) হাত ছাড়িয়ে নেন। এবং বয়াতকারীদের নিয়ে দোয়া করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বয়াত কোন সাধারণ দীক্ষা অনুষ্ঠান নয়। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন। তিনি এজন্য বয়াতগ্রহণকারীর হাত স্পর্শ করেন যাতে বয়াতগ্রহণকারী ব্যক্তি তার পবিত্র অঙ্গীকারের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হযরত আহমদ মহিলা বয়াতকারীদের ক্ষেত্রে হাতে হাত রাখতেন না। তিনি তাদের শুধু বয়াতের শর্তাবলী উচ্চারণ করতে বলতেন এবং সবশেষে তাদেরকে দোয়ায় শামিল করতেন।

হযরত আহমদ (আঃ) ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত লুধিয়ানাতে ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ তাঁর হাতে বয়াত করতেন। তিনি লুধিয়ানা থেকে ফিরে আসার সময় বেশ কিছু লোক এ জামাতে প্রবেশ করেন।

১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চের সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিনে যারা বয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম একটি নিবন্ধন বইতে লিপিবদ্ধ ছিল। নিবন্ধন বইটি প্রথমে হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিল। পরবর্তীতে তিনি তা হযরত আহমদ (আঃ)-এর পুত্র মির্যা বশীর আহমদের নিকট হস্তান্তর করেন। মির্যা বশীর আহমদ তা খেলাফত লাইব্রেরীতে রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই ঐতিহাসিক দলিলের প্রথম পাতাটি হারিয়ে গেছে। এ পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল প্রথম বয়াতকারী আট জনের নাম।

১৯০৮ সালে হযরত আহমদের (আঃ) মৃত্যুর পর বয়াত গ্রহণের কর্তৃত্ব বর্তায় হযরত আহমদের (আঃ) পরবর্তী খলীফাদের উপর।

আজ ১১৩ বৎসর পরও বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠানটি রয়ে গেছে খুবই সাধারণ অনাড়ম্বরপূর্ণ, সেই প্রথম দিনের মতোই।

(The Review of Religions-এর বিশেষ শতবার্ষিকী সংখ্যায় (২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ইং) প্রকাশিত মোবারক আহমদ সাকী রচিত The first Bai'at-এর অনুবাদ)

অনুবাদ- **আহমদ মইনুল কাদের হিমু**

স্মৃতির জাল বোনা

খোদাতাআলার অশেষ ফযল এবং রহমত যে বিগত তিন বছর যাবৎ বাংলাদেশে আগত হুযূর (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধিবর্গের সেবা করার সুযোগ দান করেছেন। এবার বাংলাদেশের ৭৮তম ন্যাশনাল সালানা জলসায় হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। তিনি বর্তমানে নাযের খেদমতে দরবেশান হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। ১৯৯৭ সনেও তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন।

৩ তারিখ রাতে আমরা গেষ্ট হাউজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি। এদিন নুরুদ্দিনও আমাদের সাথে ছিল। পরে পরীক্ষার জন্য সে আর Duty-তে যোগ দিতে পারে নি। পরের দিন আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। দুপুরের খানিক আগে মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব মসজিদে আসেন। তাঁর সাথে প্রথম Duty আমার। মনে মনে ভয়, শংকা এবং আনন্দ যুগপৎ সমান্তরালভাবেই চলছিল। গেষ্ট হাউজে Duty-এর একটি সূত্র হলো প্রথম ২৪ ঘন্টা ঠিকমত পার করতে পারলে আর কোন অসুবিধা হয় না। খোদার অশেষ ফযলে এ গুরুদায়িত্বের শুরু খুব সফলভাবেই আমরা করতে পেরেছিলাম। প্রতিদিন সকালে আমাদের Morning Walk ছিল খুবই সুন্দর এবং প্রাণবন্ত। গাড়িতে নযম, কৌতুক ইত্যাদি চলতো উৎসাহের সাথে। আমাদের বিশিষ্ট নযম গায়ক কোকিলকণ্ঠ তৌফিককে গাড়িতে নেয়া হতো শুধু মাত্র নযম শোনানোর জন্য। ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সাহচর্যে আমাদের পদচারণা হতো প্রাঞ্জল এবং উৎসবমুখর।

সকালে ফযরের নামাযের পর স্যার কিছুক্ষণ তেলাওয়াত করতেন। [হুযূর (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধিকে আমরা 'স্যার' বলে ডাকতাম] তেলাওয়াতের পর তিনি হাঁটতে বেরুতেন। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সকালের নাস্তা করতেন। নাস্তাও এত সাধারণ যে, তা উল্লেখ করার মত নয়। নাস্তার পর তিনি Newspaper পড়তেন। এরপর যোহরের আগে পর্যন্ত সভা অথবা কোন বক্তৃতার নোট তৈরীতে ব্যস্ত থাকতেন। ১১.৩০টার দিকে চা-এর সাথে অন্য কোন হালকা নাস্তা খেতেন। দুপুরের গোসলের পর নামাযে যেতেন। নামায আদায়ান্তে তিনি খাবার গ্রহণ করতেন। শাকসব্জি আর ডালই ছিল তাঁর পসন্দের তালিকায়। তিনি ভাত খেতেন না। রুটিই ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। দুপুরের খাবারের পর কোন কাজ বা সভা না থাকলে রুমেই থাকতেন। তখন হয়তো বিশ্রাম নিতেন অথবা MTA-তে প্রোগ্রাম দেখতেন। দুপুরের খাবারের সাথে সাথে তিনি চা পান করতেন। আর ধান সিঁড়ির দইটা তিনি খুবই পসন্দ করতেন। অন্যান্য খাদ্যতালিকার মধ্যে জুস বিশেষতঃ LEMON জুসটা তিনি গ্রহণ করতেন। বিকালের পর জামাতী কাজে আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে যেতেন। আসরের নামাযের পর জামাতী কর্মকর্তাদের সাথে মিটিংয়ে মিলিত হতেন। মাগরিবের পর ইশা পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত থাকতেন। অনেক সময় রাত ১২.০০টা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জলসার আগের দিন গেষ্ট হাউজে আসেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ প্রফেসর ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম। এছাড়া মোহতরম মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেবও দু'দিন গেষ্ট হাউজে ছিলেন। তাঁদের সাহচর্য এবং দোয়া লাভের সুযোগও হয়েছিল। জলসার সময় ছিল খুবই নাজুক এবং ব্যস্ততার। খোদাতাআলার অশেষ ফযলে জলসা খুবই সফলতার সাথে শেষ হয়। এরপর শুরু হয় তাঁর বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন। প্রথমেই তিনি ফতুল্লায় যান। ফতুল্লায় মসজিদ তৈরী এবং মসজিদ আবাদ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য হয়। সেখান থেকে ফিরে বিকালে যান মিরপুরে। মিরপুরে তিনি বক্তব্য রাখেন 'সর্বাবস্থায় খোদার নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকা' বিষয়ে। চট্টগ্রাম জলসায় তাঁর সফরে একই গাড়িতে ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, কোকিলকণ্ঠ (বুলবুলে বাংলা) বিশিষ্ট নযম শিল্পী ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব, শিহাব ভাই, মাসুম, আশরাফ এবং খাকসার। আমরা প্রথমে ঘাটুরা জামাতে যাত্রাবিরতি করি। সেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর হাল্‌কা নাস্তা করে রওয়ানা দেই তারুয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে নামাযে যোহর আসর আদায়ের পর বক্তৃতা করেন। এরপর দুপুরের খাবার গ্রহণ করি। কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করে আমরা যাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত সফর সমাপনান্তে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। সমস্ত রাস্তায় গাড়িতে নযম ও বক্তৃতার প্রাচীন ক্যাসেটগুলো বাজাতে থাকেন ইব্রায়েত ভাই। কৌতুক, বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকরণ ইত্যাদির মধ্যে কখন যে চট্টগ্রাম পৌছে গেলাম বুঝতেই পারিনি। চট্টগ্রামে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হলো। গেষ্ট হাউজে আমাদের সাথে চট্টগ্রামের খাদেমগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ডিউটি করতে থাকলেন। জলসার দ্বিতীয় দিন আমি, স্যার, আমীর সাহেব, চট্টগ্রামের জেনারেল সেক্রেটারী ও ইব্রায়েত ভাই পতেঙ্গা Sea-Beach-এ যাই এবং একটি রেষ্টুরেন্টে সকালের নাস্তা করি। ঐদিন প্রশ্নোত্তর সেশন শেষ করে স্যারকে নিয়ে দাওয়াত খেতে যাই জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের বাসায়। রাত ১.৩০টায় গেষ্ট হাউজে ফিরে সবাইকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা ডিউটিম্যান এবং MTA Crew গণ রাত ৩.০০টা পর্যন্ত এজলাস বসাই। আনন্দের বন্যায় পুলকিত হই সবাই। জলসার সফল সমাপ্তিতে আমরা শুকরিয়া এবং খোদার দরবারে বিনয়ে নত হই।

চট্টগ্রাম জলসা থেকে ফিরতি পথে আমরা কুমিল্লা জামাতে যাত্রাবিরতি করি। ঢাকায় এসে পৌছাই ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখ। তাঁর এই বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে তিনি দু'টি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান করেন- যা হুযূর (আইঃ) তাঁর উপর সোপর্দ করেছিলেন। স্যারের সাথে ডিউটিকালীন সময়ে দোয়া চাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বলেছেন, তোমার প্রয়োজনে আমার কাছে চিঠি লিখো। কয়েকদিন আগে ভুল উর্দূতে চিঠি লিখেছি। প্রয়োজন একটাই। তা হলো দোয়া।

১৮ তারিখ তাঁর বিদায় বেলা আমি এয়ারপোর্ট -এ যেতে পারি নি। মসজিদ কমপ্লেক্সেই বিদায় জানাই। বিদায়কে আমার খুবই ভয়। ক্ষুদ্র পরিচয়ে এত গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় তা ভাবতেও অবাক লাগে। খোদার আশীষপ্রাপ্ত বান্দাদের সাহচর্যে এত আনন্দের হয় তা ভাবতে পুলক শিহরণ জাগে। খোদার কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা - অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যে আশীষ আমায় তিনি দান করেছেন তা বহন করার শক্তি যেন আমায় দেন। এজন্য আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী, আমীন।

- মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব (জয়)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। ২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা"

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসার সাফল্যজনক সমাপ্তি

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে গত ২৮-২৯ মার্চ, ২০০২ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জেরে তবলীগ ও নও মুবায়েঈন সহ প্রায় ২০০০জন উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে মার্চ বিকেল ৩.২৫ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম, উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ ও বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব শাব্বির আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও দোয়া করান ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

"কবুলিয়তে দোয়ার মাধ্যমে জীবন্ত খোদার পরিচয়" সম্বন্ধে মাওলানা সালেহ আহমদ এবং "মালী কুরবানীর গুরুত্ব" সম্বন্ধে জনাব এস, এম, আব্দুল আযীয মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে পড়ার পরে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য়। এ অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জি, এম, ফিরোজ আহমদ ও নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান ও জনাব পানাউল্লাহ্‌। "হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন" সম্বন্ধে মৌঃ এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম "মহানবী (সঃ)-এর জীবনাদর্শ" সম্বন্ধে মাওলানা সালেহ আহমদ, "খাতামান্ নবীঈনের মকাম ও মর্যাদা" সম্বন্ধে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এরপরে অধিক রাত পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর

২৯/০৩/২০০২ইং শুক্রবার বিকেল ৩.১৫ মিনিটে মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় এর সভাপতিত্বে জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন করীম থেকে তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব জি, এম, শাব্বির আহমদ ও উর্দূ নযম পেশ করেন তৌফিক আহমদ ও হিন্দী নযম শুনান মোহাম্মদ ইব্রায়েতুল হাসান।এ অধিবেশনে আরো নযম পেশ করেন সর্বজনাব এস, এম, তারিকুল ইসলাম, মুনীর হোসেন ও পানাউল্লাহ্‌ সাহেব। "তরবীয়তে আওলাদ" সম্বন্ধে জনাব জি, এম, মতিয়ার রহমান, "প্রকৃত আহমদীর পরিচয়" সম্বন্ধে জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান, "ইসলাম নারীর মর্যাদা" সম্বন্ধে জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, "বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে জনাব কওসার আলী মোল্লা এবং "ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ" সম্বন্ধে মাওলানা সালেহ আহমদ, এবং "বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাত" সম্বন্ধে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

সন্ধ্যা ৬-৭টা পর্যন্ত হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা শুনানো হয়। এর পরে নসীহ্‌তমূলক বক্তব্য রাখেন ও দোয়ার এলান করেন স্থানীয় আমীর জনাব এস, এম, আবূ কাওসার। সবশেষে সমাপনী ভাষণ দেন ও দোয়া করান আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

এই জলসায় আকর্শনীয় বিষয় ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ পর্বে প্রায় ৬০ জন হিন্দু ভ্রাতা ও শতাধিক মহিলাসহ ৫০০ জনের মত জেরে তবলীগ অতিথি অংশগ্রহণ করেন ও হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। প্রথমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে উক্ত জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আইঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শুনান আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মৌলবী আহমদ তারেক মোবাশ্বের। সকল প্রশ্নের যথোপযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী উত্তর প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোবাল্লেগ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

- আহমদী বার্তা

রাজশাহী রিজিওন (১) ওয়াকফে নও সন্তান এবং পিতা-মাতার ৪র্থ বার্ষিক তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাজশাহী রিজিওন (১) ওয়াক্‌ফে নও ছেলে-মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাদের চতুর্থ বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ১৪/০৩/২০০২ইং হ'তে ১৬/০৩/২০০২ইং পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর এ অনুষ্ঠিত হয় (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)। উক্ত ক্লাসে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে এবং তাদের পিতা-মাতারা অংশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এবং রাজশাহী বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারী অধ্যাপক রাজীব উদ্দিন আহমদ উক্ত ক্লাস ও সম্মেলনে যোগদান করেন। দু'দিন ব্যাপী এই ক্লাস পরিচালনা করেন সর্ব জনাব অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ, মোয়াল্লেম এস. এম. আব্দুল হক, ইসরাঈল দেওয়ান (অবঃ মোয়াল্লেম), মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান এবং মোয়াল্লেম হুমায়ুন কবির।

১৫/০৩/০২ইং তারিখ রাত্রি ৮টা থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বিষয় যেমন কুরআন, হাদীস, নযম, দীনি মা'লুমাত, লিখিত পরীক্ষা ও স্মৃতি-শক্তি পরীক্ষা শুরু হয়। পরদিন ১৬/০৩/২০০২ইং তারিখে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। পিতা-মাতাগণেরও বিভিন্ন পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বজনাব এস, এম, আব্দুল হক, কামরুল ইসলাম প্রধান, মাহমুদ আহমদ শরীফ, ইসরাইল দেওয়ান প্রমুখ মোয়াল্লেমগণ।

১৬/০৩/২০০২ বিকাল ৩টায় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতারম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ওয়াক্‌ফে নও যথাক্রমে এনামুর রহমান ও এহসান উদ্দীন। মাতা ও পিতাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে নাসিমা বশির ও আনিছুর রহমান। নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর এবং বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারী অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও মহোদয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতারম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে ৩দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উল্লেখ্য, এবারের অনুষ্ঠানে ৩৫ জন ওয়াকফে নও সন্তান, পিতা ১৬জন এবং মাতা ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন, এদের মধ্যে জি. এস. জনাব এ, কে মহীউদ্দীন সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ
সহকারী সেক্রেটারী
ওয়াকফে নও, রাজশাহী বিভাগ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের খেদমতে খাল্‌ক-বিভাগের রিপোর্ট

গত ২৩-০২-২০০২ইং তারিখে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের খেদমতে খাল্‌ক বিভাগের উদ্যোগে একটি গরু কুরবানী দেয়া হয়েছে এবং ৬০টি পরিবারের মধ্যে ২৫০গ্রাম করে তিন প্রকার মসলা মোট ১৮০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়। উক্ত কুরবানীর সময় উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর-১ জনাব আব্দুস সামাদ সাহেব এবং নায়েব সদর-২ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম সাহেব। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মিরপুরের মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ। আমরা ৭০টি পরিবারের মধ্যে ও অন্যান্য আরো ৬০ জনের মধ্যে উক্ত কুরাবানীর মাংস বিতরণ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

মীর ওয়াজেদ আলী
নায়েম খেদমতে খালক
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর

কবিতা

প্রার্থনা

হে বিশ্বপালক করুণা সিন্ধু
তব দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ।
মাগি হে মিনতি নিশি জাগিয়া
হে পরম বন্ধু বিশ্বরাজ!
করি এ মিনতি ওগো দয়াময়
করুণা নেত্রে বারেক চাও।
তব সৃষ্টিসমূহে যত কিছু পাপ-তাপ
ভ্রান্তি তিমির নাশিয়া দাও।
দিশা হারা ভ্রান্ত যারা
ভ্রষ্ট যারা লক্ষ্য পথ।
সত্যের জ্যোতিঃ বক্ষে ঢালি
দেখাও তাদের সরল পথ।
মৃত জনে প্রাণ সঞ্চারী
অন্ধজনে দাও আলো।
বধির জনে শ্রবণ দিয়ে
অন্ধ কারায় প্রদীপ জ্বালো।
ব্যাধি ভরা পঙ্গু যারা
জরা জীর্ণ কর দূর!
বোবার মুখে ফোটাও বাণী
বক্ষে ঢালি দীনের নূর॥

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

শুভ বিবাহ

♦মরহুম কেরামত আলী-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ উম্মে কুলুসম (পুষ্প), সাং- ৬১, মোকরবা রোড, নগর খান পুর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, এর সাথে জনাব শাকের আহমদ ভুইয়া-এর পুত্র জনাব কাউসার আহমদ,সাং ক্রোড়া, আখাউড়া, জেলা- বি, বাড়ীয়া-এর বিয়ে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৩/০১/২০০২ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ, নগর খানপুর হালকায় অনুষ্ঠিত হয় আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ দেওয়ান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, ২৪, নবাব সলিমুল্লাহ্ রোড, মিশন পাড়া, নারায়ণগঞ্জ। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৬২/০২ তারিখ ১০/০৩/০২।

♦জনাব আব্দুর রহিম-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ শারমিন আক্তার সুমনা, সাং- তে-বাড়ীয়া দক্ষিণপাড়া, নাটোর-এর সাথে মোঃ জয়েন উদ্দিন এর পুত্র জনাব মোঃ কুদরত আলী, সাং- তে-বাড়ীয়া দক্ষিণপাড়া, নাটোর-এর বিয়ে ১৫,০০১/= (পনর হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৭/০২/২০০২ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তে-বাড়ীয়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৬৩/০২ তারিখ ১০/০৩/০২।

♦জনাব শহীদ মমতাজ উদ্দীন-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ ফাতেমাতুজ্ জহুরা, সাং- নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনা-এর সাথে মোহাম্মদ ইসমাঈল সরদার-এর পুত্র জনাব সুলতান আহমদ, সাং- ছোট কুপট, পোঃ নওয়াবেঁকী, থানা- শ্যামপুর, জেলা- সাতক্ষীরা-এর বিয়ে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২২/০২/২০০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনাস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কৃর্তক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৬৫/০২ তারিখ ১৪/০৩/০২।

♦জনাব মোহাম্মদ এনাম খান-এর কন্যা, মোসাম্মাৎ নাজমা বেগম, সাং- মৌলবী পাড়া, জেলা- বি, বাড়ীয়া-এর সাথে জনাব আব্দুস সাত্তার-এর পুত্র জনাব হাফিজুর রহমান সাং- নোয়াপাড়া, ডাকঘর- গৌরারং, জেলা- সুনামগঞ্জ-এর বিয়ে ১০,০০১/= (দশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৫/০৩/২০০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি-বাড়ীয়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব জনাব মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৬৬/০২ তারিখ ১৯/০৩/০২।

♦জনাব এ, বি, এম শফিউল আলম বরকত -এর কন্যা, মোসাম্মাৎ আকলিমা বেগম, সাং- শিমরাইলকান্দি, জেলা- বি, বাড়ীয়া-এর সাথে মরহুম সৈয়্যদ সালেহ আহমদ-এর পুত্র জনাব সৈয়্যদ রাকিব আহমদ সাং- মোড়াইল (মীরবাড়ী), জেলা-বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৫/০৯/০১ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি-বাড়ীয়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মোহাম্মদ এস, এম, হাবিবুল্লাহ্, পিতা- মরহুম এস, এস সলিমুল্লাহ্, ঘাটুরা, বি-বাড়ীয়া। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০২৬৭/০২ তারিখ ১৯/০৩/০২।

এ বিয়েগুলো সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

বানিয়াজান মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বানিয়াজানের নতুন মসজিদ উদ্বোধন

বানিয়াজান জামাতের নতুন মসজিদ উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে ২১শে মার্চ-২০০২ইং রোজ বৃহস্পতিবার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ মোহতারম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, এডিশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও নও-মোবাঈন খাকসার ও খোদ্দামের একজন সদস্য জনাব আব্দুল মোমেন সহ আমরা বিকেলে দিঘপাইত পৌঁছি। ছোনটিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব আফসার আলী ফকির সাহেবের বাসায় বাদ মাগরিব তবলীগি আলোচনা হয়। এতে ৩ (তিন) জন জেরে তবলীগের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়। এতে জনাব লিয়াকত সাহেব বয়াত করেন।

পরে রাত্রে ১০টার দিকে সরিষাবাড়ী পৌঁছে যাই। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক সাহেবের বাড়ীতেই রাত্রিবাস করি। সরিষাবাড়ীর প্রেসিডেন্ট জনাব হাবিলউদ্দিনের সাথে বহু রাত পর্যন্ত জামাতী আলোচনা হয়।

পরদিন ২২ তারিখ শুক্রবার আমরা ১০টার মধ্যেই বানিয়াজানের দিকে যাত্রা করি। ১১টার মধ্যেই বানিয়াজান পৌঁছে যাই। জুমুআর নামাযের সময় জামালপুর থেকে সরিষাবাড়ীর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম সাহেব আর জামালপুরের সিদ্দীক সাহেব এসে আমাদের সাথে নামাযে শামিল হন। জুমুআর খুতবা প্রদান করেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তিনি হুযূর (আইঃ)-এর (সিড্নীতে মসজিদ উদ্বোধনীতে যে খুতবা দিয়েছিলেন) খুতবার আলোকে প্রাণবন্ত খুতবা প্রদান করেন।

বাদ জুমুআ বানিয়াজান মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ এর সভাপতিত্বে স্থানীয় একজন খাদেমের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল বারিক, সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মুজাফ্ফর আহমদ, লাজনার প্রেসিডেন্ট এবং খাকসারের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদ সাদেক মাহমুদ তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। অতঃপর সভাপতির হৃদয়স্পর্শী ভাষণ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

- আব্দুল জব্বার

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের কর্মসূচী পালিত

২৩শে মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এ দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) লুধিয়ানা শহরে প্রথম বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন। তাই এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে জাগরূক রাখার জন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবর্গ প্রতিবছর এ দিনে সভা-সম্মেলন করে থাকেন। এবারও বাংলাদেশের স্থানীয় জামাত ও বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এ দিনে এবং পরে কোন এক দিনেও সভা-সম্মেলন করার মাধ্যমে এ দিনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে সভা সম্মেলন হওয়ার খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেবাড়ীয়া, শৈলমারী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেরগাতী, চরসিন্দুর, কিছমত মিনানগর- রংপুর, ডোহান্ডা, আহমদনগর জামাত ও মজলিসে আনসারুল্লাহ্ খুলনা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া।

- আহমদী বার্তা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের ২১তম সালানা জলসায় যোগদানকারী ইমাম মাহ্দী (আঃ) -এর মেহমানদেরকে আপ্যায়নের জন্য অত্র জামাতের প্রবীণ সদস্য মরহুম আবদুস সামাদ গাজী সাহেবের সমাধির পার্শ্বে জবাই করা গরুর মাংস প্রস্তুত করা হচ্ছে।

New Vol. No. 64 ❑ 18th Issue March 31, 2002 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST		
FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com